অধ্যায় : ১ ভাষা
পরিচ্ছেদ : ১ ভাষা

মানব সভ্যতা বিকাশে ভাষার অবদান

মানব সভ্যতার ইতিহাস ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। মানুষ আগুন ব্যবহার করেছে, পাথরের হাতিয়ার বানিয়েছে, শিকার করেছে, গোষ্ঠী গঠন করেছে। তবু এসব অর্জন স্থায়ী সভ্যতায় পরিণত হয়েছে তখনই, যখন মানুষ অভিজ্ঞতাকে শব্দে, স্মৃতিকে কাহিনিতে, নিয়মকে নির্দেশে এবং জ্ঞানকে প্রজন্মান্তর বহন করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। ভাষা মানুষকে শুধু কথা বলার শক্তি দেয়নি; ভাষা মানুষকে ভাবতে, সংগঠিত হতে, শেখাতে, শিখতে, বিশ্বাস গড়তে, আইন তৈরি করতে, ইতিহাস সংরক্ষণ করতে এবং সংস্কৃতি নির্মাণ করতে সাহায্য করেছে। তাই ভাষাকে মানব সভ্যতার প্রাণশক্তি বলা যায়। সভ্যতার বাহ্যিক রূপ হলো নগর, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, ধর্ম, আইন ও প্রযুক্তি। আর এগুলোর অন্তর্গত সংগঠন তৈরি করে ভাষা।

এডওয়ার্ড স্যাপির ভাষাকে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্জন হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, ভাষা হলো মানুষের ভাব, আবেগ ও ইচ্ছা প্রকাশের সম্পূর্ণ মানবিক এবং অ-প্রবৃত্তিগত পদ্ধতি। এটি স্বেচ্ছায় উৎপাদিত প্রতীকের মাধ্যমে কাজ করে।[৩৩] এই সংজ্ঞা আমাদের জানায় যে ভাষা জন্মগত চিৎকার বা প্রাণীর সংকেতের মতো নয়। ভাষা সমাজে শেখা হয়। ভাষা সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে। মানুষের সভ্যতা সেই কারণেই ভাষার ওপর নির্ভরশীল। কারণ ভাষা ছাড়া সামাজিক শিক্ষা, অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং যৌথ স্মৃতির স্থায়িত্ব সম্ভব নয়।

মানুষের প্রথম সভ্যতাগুলো গড়ে ওঠে সহযোগিতার ভিত্তিতে। কৃষি, শিকার, নদীভিত্তিক বসতি, খাদ্যসংগ্রহ, গৃহনির্মাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা– সব ক্ষেত্রেই মানুষের দরকার ছিল পারস্পরিক নির্দেশ ও বোঝাপড়া। ভাষা সেই বোঝাপড়াকে সুসংগঠিত করে। ব্রিটানিকার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় বার্নার্ড ব্লখ ও জর্জ ট্রেগারের সংজ্ঞার্থ উদ্ধৃত হয়েছে: 'ভাষা হলো স্বেচ্ছাচারী মৌখিক প্রতীকের একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একটি সামাজিক গোষ্ঠী সহযোগিতা করে।[৩৪] এই সংজ্ঞার্থের গুরুত্ব এখানে যে ভাষা ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। ভাষা সামাজিক সহযোগিতার পদ্ধতি। মানুষ একা সভ্যতা তৈরি করেনি। ভাষা মানুষের সমষ্টিগত কাজকে সুসংহত করেছে।

সভ্যতার বিকাশে ভাষার আরেকটি বড়ো অবদান হলো চিন্তাকে আকার দেওয়া। মানুষ যা দেখে, যা অনুভব করে, যা কল্পনা করে– ভাষা তার নাম দেয়। নামকরণ না হলে জ্ঞান স্থায়ী হয় না। কোনো বস্তু, ঘটনা, সম্পর্ক বা নিয়মকে ভাষায় ধারণ না করলে তা সামাজিক ব্যবহারে প্রবেশ করে না। এডওয়ার্ড স্যাপির তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে লিখেছেন, 'ভাষা সামাজিক বাস্তবতার পথপ্রদর্শক।' তিনি আরও বলেছেন, 'মানুষ শুধু বস্তুনিষ্ঠ জগতে বাস করে না; সে অনেকাংশে সেই ভাষার অধীন থাকে, যা তার সমাজের প্রকাশমাধ্যম হয়ে উঠেছে।[৩৫] এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ভাষা শুধু বাস্তবতার প্রতিবিম্ব নয়। ভাষা বাস্তবতাকে বোঝার পদ্ধতিও তৈরি করে। আইন, ধর্ম, পরিবার, সম্পত্তি, ন্যায়, অন্যায়, জাতি, অধিকার– এসব সভ্যতাগত ধারণা ভাষার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়।

ফার্দিনান্দ দা সসুর ভাষাকে চিহ্নব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, ভাষা হলো এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে ধ্বনি ও ধারণা সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে অর্থ পায়। ভাষার এই প্রতীকী ক্ষমতা সভ্যতার জন্য মৌলিক। মানুষ শুধু উপস্থিত বস্তুর কথা বলে না। মানুষ অতীত, ভবিষ্যৎ, স্বপ্ন, ভয়, বিধান, নৈতিকতা ও কল্পনার কথাও বলে। এ ক্ষমতা মানুষের সভ্যতাকে প্রাণিজগতের সংকেতব্যবস্থা থেকে আলাদা করে। একটি সমাজ যখন বলে 'আইন', 'রাষ্ট্র', 'ধর্ম', 'শিক্ষা', 'ঐতিহ্য', তখন সেসব শব্দ শুধু শব্দ থাকে না। এগুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। ভাষা সেই অদৃশ্য ধারণাগুলোকে দৃশ্যমান সামাজিক শক্তিতে পরিণত করে।

মানবসভ্যতার বিকাশে লিখিত ভাষার ভূমিকা আরও গভীর। মুখের ভাষা ক্ষণস্থায়ী। লেখা ভাষাকে স্থায়ী করে। ব্রিটানিকার লেখাবিষয়ক আলোচনায় বলা হয়েছে, লেখা ভাষাকে দৃশ্যমান করে; কথ্য ভাষা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু লেখা তুলনামূলকভাবে স্থায়ী।[৩৬] এই স্থায়িত্ব সভ্যতার ইতিহাসে বিপ্লব ঘটায়। লিখিত ভাষার মাধ্যমে ভূমির মালিকানা, করব্যবস্থা, ধর্মীয় বিধান, প্রশাসনিক আদেশ, চিকিৎসা জ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাস সংরক্ষিত হয়। মেসোপটেমিয়া, মিশর, চীন ও ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে লিখনপদ্ধতির ভূমিকা তাই মৌলিক। লেখা না থাকলে রাষ্ট্রের প্রশাসন দুর্বল থাকত। বিচারব্যবস্থা স্মৃতিনির্ভর থাকত। শিক্ষা কেবল মুখে মুখে সীমাবদ্ধ থাকত।

---

৩৩. *Edward Sapir, Language: An Introduction to the Studz of Speech, 1921, Project Gutenberg edition. উদ্ধৃতি: ভাষা মানুষের ভাব, আবেগ ও ইচ্ছা প্রকাশের মানবিক ও অ-প্রবৃত্তিগত পদ্ধতি। (Project Gutenberg)*

৩৪. *Encyclopaedia Britannica, "Language", Robert Henry Robins. উদ্ধৃতি: ভাষা সামাজিক সহযোগিতার স্বেচ্ছাচারী মৌখিক প্রতীকব্যবস্থা; ভাষার কাজ যোগাযোগ, পরিচয় প্রকাশ, কল্পনা ও আবেগমোচন। (Encyclopedia Britannica)*

৩৫. *Edward Sapir, "The Status of Linguistics as a Science", Language, Vol. 5, No. 4, 1929. উদ্ধৃতি: ভাষা সামাজিক বাস্তবতার পথপ্রদর্শক। (Bible Researcher)*

৩৬. *Encyclopaedia Britannica, "Writing", David R. Olson. উদ্ধৃতি: লেখা ভাষাকে দৃশ্যমান করে এবং ভাষাকে স্থায়ী রূপ দেয়। (Encyclopedia Britannica)*

জ্যাক গুডি লিখিত সংস্কৃতির সামাজিক প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের আলোচনায় বলা হয়েছে, লেখার প্রবর্তন ও লিখিত ঐতিহ্যের বিকাশ ধর্মীয় ও আইনি ব্যবস্থাসহ মানব সমাজের বহু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ব্যাখ্যায় ভূমিকা রাখে।[৩৭] এখানে ভাষার অবদান স্পষ্ট। ভাষা যখন লিখিত রূপ পায়, তখন জ্ঞান ব্যক্তির স্মৃতি থেকে বের হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, আদালত, দপ্তর, ধর্মগ্রন্থ, বিজ্ঞানচর্চা– এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে লিখিত ভাষা প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

ভাষা সংস্কৃতির ধারক। লোককথা, গান, প্রবাদ, মিথ, আচার, ধর্মীয় বচন, ঐতিহাসিক স্মৃতি– এসব ভাষার ভেতরেই সংরক্ষিত থাকে। ইউনেস্কো ভাষাকে মানবজাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ইউনেস্কোর ভাষা-বৈচিত্র্য বিষয়ক আলোচনায় বলা হয়েছে, ভাষা ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের ভান্ডার।[৩৮] কোনো ভাষা হারিয়ে গেলে শুধু শব্দ হারায় না; হারিয়ে যায় মানুষের স্মৃতি, স্থানীয় জ্ঞান, পকতিবোধ, চিকিৎসা-পদ্ধতি, জীবনদশন এবং সমাজের আত্মপরিচয়। তাই ভাষা সভ্যতার জ্ঞানভান্ডার। ভাষার মৃত্যু মানে একটি সভ্যতার অভ্যন্তরীণ আলো নিভে যাওয়া।

ভাষা শিক্ষার মূল মাধ্যম। মানুষ জন্মের পরে পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয় থেকে ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নৈতিকতা, শিল্প– সবই ভাষার সাহায্যে শেখানো হয়। ইউনেস্কো মাতৃভাষার শিক্ষাগত গুরুত্ব স্বীকার করেছে। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক সমাজ ভাষার মাধ্যমেই টিকে থাকে; ভাষা ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও পরিবহণ করে।[৩৯] এ কারণে মাতৃভাষা শুধু আবেগের বিষয় নয়। এটি শিক্ষার মান, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার প্রশ্ন।

সভ্যতার রাজনৈতিক বিকাশেও ভাষার শক্তি অপরিসীম। ভাষা জাতিসত্তা গড়ে তুলে। ভাষা মানুষকে বলে, সে কার উত্তরাধিকার বহন করছে। বাংলা ভাষা আন্দোলন এর এক ঐতিহাসিক উদাহরণ। ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের ধারণা বাংলাদেশের উদ্যোগে আসে; ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে তা অনুমোদিত হয় এবং ২০০০ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে।[৪০] এই তথ্য দেখায় যে, ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়। ভাষা অধিকার, মর্যাদা ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের ভিত্তি। বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম মানবসভ্যতার ইতিহাসে ভাষার মর্যাদাকে আন্তর্জাতিক আলোচনায় নিয়ে এসেছে।

ভাষা মানুষকে নৈতিক ও কল্পনাশীল সত্তায় পরিণত করে। মানুষ ভাষার মাধ্যমে শুধু খবর জানায় না। মানুষ কবিতা লেখে, শোক প্রকাশ করে, ভালোবাসা জানায়, প্রার্থনা করে, প্রতিবাদ করে, স্বপ্ন রচনা করে। ব্রিটানিকা ভাষার কাজ হিসেবে যোগাযোগ, পরিচয় প্রকাশ, খেলা, কল্পনামূলক প্রকাশ এবং আবেগ মোচনের কথা উল্লেখ করেছে।' মানব সভ্যতার শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, নাটক, দর্শন ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ভাষা ছাড়া পূর্ণতা পেত না। ভাষা মানুষকে কেবল ব্যবহারিক প্রাণী থেকে সাংস্কৃতিক প্রাণীতে উন্নীত করেছে।

আধুনিক সভ্যতায় ভাষার অবদান আরও বিস্তৃত হয়েছে। আইন, চিকিৎসা, গণমাধ্যম, কূটনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা– সব ক্ষেত্রেই ভাষা কাজ করছে জ্ঞানের সংগঠক হিসেবে। ভাষা না থাকলে তথ্য থাকে বিচ্ছিন্ন। ভাষা তথ্যকে ব্যাখ্যা করে। ভাষা ব্যাখ্যাকে জ্ঞানে পরিণত করে, জ্ঞানকে সমাজে প্রয়োগযোগ্য করে তোলে। তাই মানব সভ্যতার প্রতিটি উন্নত স্তরে ভাষা এক নীরব স্থপতির মতো কাজ করেছে।

মানব সভ্যতার বিকাশে ভাষার অবদান মৌলিক, গভীর এবং সর্বব্যাপী। ভাষা মানুষকে গোষ্ঠীজীবন থেকে সামাজিক জীবনে, অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞানে, স্মৃতি থেকে ইতিহাসে, ধ্বনি থেকে সাহিত্যে, নির্দেশ থেকে আইনে এবং সংস্কৃতি থেকে সভ্যতায় উত্তীর্ণ করেছে। ভাষা ছাড়া মানুষের বুদ্ধি থাকত, কিন্তু তা সামাজিক রূপ পেত না। ভাষা ছাড়া অভিজ্ঞতা থাকত, কিন্তু তা উত্তরাধিকার হতো না। ভাষা ছাড়া সমাজ থাকত, কিন্তু সভ্যতার ধারাবাহিকতা দুর্বল থাকত। তাই ভাষা মানব সভ্যতার কেবল একটি উপাদান নয়; ভাষা সভ্যতার চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও আত্মপরিচয়ের প্রধান আধার।

---

৩৭. *Jack Goodz, The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge University Press, 1986. উদ্ধৃতি: লেখার প্রবর্তন ও লিখিত ঐতিহ্য ধর্মীয় ও আইনি ব্যবস্থাসহ সমাজের সংগঠনে প্রভাব ফেলে। (mitpressbookstore)*

৩৮. *UNESCO, "World Atlas of Languages" বিষয়ক আলোচনা, ২০২৪. উদ্ধৃতি: ভাষা ইতিহাস, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের ভান্ডার। (UNESCO)*

৩৯. *UNESCO, "International Mother Language Day". উদ্ধৃতি: বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক সমাজ ভাষার মাধ্যমে ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে। (UNESCO)*

৪০. *UNESCO, "International Mother Language Day". উদ্ধৃতি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলাদেশের উদ্যোগে আসে, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো অনুমোদন করে এবং ২০০০ সাল থেকে পালিত হচ্ছে। (UNESCO)*

আন্তর্জাতিক সহায়ক ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা

আন্তর্জাতিক ভাষার ধারণা

যে ভাষা বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষ তাদের মাতৃভাষা ব্যতীত পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করে, তাকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলা হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে 'আন্তর্জাতিক ভাষা' নামে কোনো নির্দিষ্ট ভাষা নেই। মূলত, একে 'আন্তর্জাতিক সহায়ক ভাষা' (International Auxiliary Language – IAL) বলা হয়।

আন্তর্জাতিক সহায়ক ভাষা হলো এমন একটি ভাষা, যা বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া সহজ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষা আধিপত্য, কূটনীতি, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রাচীনকালে ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক ভাষাসমূহ: লাতিন, গ্রিক, ভূমধ্যসাগরীয় মিশ্রভাষা

আধুনিককালে ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক ভাষাসমূহ: ইংরেজি, ফরাসি, আরবি, রুশ, স্প্যানিশ, চীনা (ম্যান্ডারিন)।

এই ভাষাগুলো রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিস্তারের ফলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক সহায়ক ভাষার বৈশিষ্ট্য

এটি প্রাকৃতিক ভাষাকে প্রতিস্থাপন করে না, বরং যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

- কিছু ভাষা প্রাকৃতিক, যেমন– ইংরেজি, ফরাসি, আরবি।
- কিছু ভাষা কৃত্রিম, যেমন– এসপেরান্তো, ইদো, ইন্টারলিঙ্গুয়া।
- জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা– ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, চীনা, রুশ ও আরবি।

বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত প্রধান আন্তর্জাতিক ভাষাসমূহ

ইংরেজি– বিশ্বের ৩৬.৯ কোটি মানুষের প্রথম ভাষা ও ৮৯.৮ কোটি মানুষের দ্বিতীয় ভাষা। মোট ১২৬.৮ কোটি মানুষ ইংরেজি ব্যবহার করে।

ফরাসি– প্রায় ২৭.৬ কোটি মানুষের ভাষা।

স্প্যানিশ, আরবি, রুশ ও চীনা ভাষা– বহু দেশে ব্যবহৃত হয়।

জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ছয়টি ভাষা ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং, আন্তর্জাতিক ভাষা হলো বৈশ্বিক যোগাযোগের মাধ্যম, যা বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আন্তর্জাতিক মিশ্রভাষা

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য, কূটনীতি ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে মিশ্রভাষার উদ্ভব হয়েছে। অনেক সময় বিজ্ঞানী ও গবেষকরা তথ্য বিনিময়ের জন্যও মিশ্রভাষা ব্যবহার করেছেন।

'Lingua Franca' শব্দটি এসেছে ভূমধ্যসাগরীয় মিশ্রভাষা থেকে, যা একাদশ থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত বাণিজ্যিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

আধুনিক যুগে ব্যবহৃত মিশ্রভাষাসমূহ: ইংরেজি, আরবি, চীনা (ম্যান্ডারিন), ফরাসি, গ্রিক, রুশ, স্প্যানিশ

কৃত্রিম ভাষা বা কৃত্রিম সর্বজনীন ভাষা

প্রাকৃতিক ভাষাকে সরলীকরণ করে সৃষ্ট ভাষাকে কৃত্রিম ভাষা বলা হয়। যখন কৃত্রিম ভাষা আন্তর্জাতিক সহায়ক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন একে কৃত্রিম সর্বজনীন ভাষা বলা হয়।

খ্রিষ্টীয় ১৭শ শতকে দার্শনিক রেনে দেকার্ত প্রথম কৃত্রিম ভাষার ধারণা দেন।

১৮শ শতকে জোয়াকিম ফুগে ফরাসি ব্যাকরণ সরলীকরণের মাধ্যমে কৃত্রিম ভাষা নির্মাণের প্রস্তাব দেন।

ভোলাপ্যুক (Volapük)

- ১৮৭৯ সালে ইয়োহান মার্টিন শ্লেয়ের প্রথম কৃত্রিম ভাষা 'ভোলাপ্যুক' তৈরি করেন।
- ১৮৮৪, ১৮৮৭ ও ১৮৮৯ সালে ভোলাপ্যুক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

● ১৮৮৭ সালে আন্তর্জাতিক ভোলাপ্যুক একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়।
তবে, ভাষার জটিলতা ও বিভক্ত মতাদর্শের কারণে ভোলাপ্যুক জনপ্রিয়তা হারায়।

এসপেরান্তো (Esperanto)

● ১৮৭৩–১৮৮৭ সালে লুডউইক লাজার জামেনহফ এসপেরান্তো ভাষার খসড়া তৈরি করেন।

● ১৮৮৭ সালে ভাষাটি প্রকাশিত হয়।

● শব্দ ও ব্যাকরণ সহজ হওয়ায় এটি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

● ১৯০৫ সালে ফ্রান্সে প্রথম আন্তর্জাতিক এসপেরান্তো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
আজ এটি পৃথিবীর অন্যতম সফল কৃত্রিম ভাষা।

এসপেরান্তোর বৈশিষ্ট্য

● সহজ ও নমনীয় শব্দগঠন

● প্রথম কৃত্রিম ভাষা, যা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়

● বর্তমানে এটি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে

● চীনে এসপেরান্তো ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়

ইদো (Ido) এবং এসপেরান্তো-জাত ভাষা

● ১৯০৭ সালে এসপেরান্তোর সংশোধিত রূপ 'ইদো' তৈরি হয়।

● প্রথমদিকে জনপ্রিয়তা পেলেও এটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

● ইদোসহ আরও কিছু ভাষাকে 'এসপেরান্তো-জাত ভাষা' বলা হয়।

অক্সিডেন্টাল (Occidental) বা ইন্টারলিঙ্গুয়ে (Interlingue)

● ১৯২২ সালে এডগার ডি ভাল এই ভাষা তৈরি করেন।

● ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের জন্য এটি সহজতর ছিল।

● ১৯৮০ সালের পর এই ভাষার ব্যবহার কমে যায়।

● বর্তমানে এটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

ইন্টারলিঙ্গুয়া (Interlingua) বা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা

● ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক সহায়ক ভাষা সংস্থা (IALA) ইন্টারলিঙ্গুয়া প্রকাশ করে।

● লাতিন ও ইউরোপীয় ভাষার সহজীকৃত রূপ।

● বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিভাষা তৈরি করা হয়েছিল।

● এটি কিছু সময়ের জন্য জনপ্রিয় হলেও পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক ভাষা বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম। ইংরেজি, ফরাসি, আরবি, রুশ, স্প্যানিশ, চীনা (ম্যান্ডারিন) বর্তমানে সবচেয়ে প্রচলিত আন্তর্জাতিক ভাষা। এসপেরান্তো, ইদো ও ইন্টারলিঙ্গুয়া কৃত্রিম ভাষার উদাহরণ। ভবিষ্যতে কৃত্রিম ভাষা আরও উন্নত হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আন্তর্জাতিক সহায়ক ভাষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

আন্তর্জাতিক সহায়ক ভাষার গুরুত্ব

আধুনিক বিশ্বে বিশ্বায়ন, প্রযুক্তি ও অর্থনীতির প্রসারের ফলে আন্তর্জাতিক ভাষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক ভাষার প্রয়োজনীয়তা

(i) **বৈশ্বিক যোগাযোগ সহজ করা:** আধুনিক যুগে অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিতে যোগাযোগই সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। আন্তর্জাতিক ভাষা সুসমন্বিত ও কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখে।

(ii) **বিশ্ব নাগরিকত্বের সুযোগ সৃষ্টি:** যে ব্যক্তি আন্তর্জাতিক ভাষা জানে, সে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে নিজেকে আত্মস্থ করতে পারে। তার কাছে নতুন দেশ নিজের মতোই পরিচিত মনে হবে।

(iii) **জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকা:** আন্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যমে একজন মানুষ বিশ্বের জ্ঞান ও গবেষণা থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পারে এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার সুযোগ পায়।

(iv) **বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও অগ্রগতি সম্পর্কে জানা:** আন্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে।

(v) **কর্মক্ষেত্রের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি:** আন্তর্জাতিক ভাষা জানা থাকলে বৈশ্বিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া সহজ হয়।

(vi) **তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন:** তথ্যপ্রযুক্তি খাত আন্তর্জাতিক ভাষার ওপর নির্ভরশীল। তাই তথ্যপ্রযুক্তির পূর্ণ সুবিধা পেতে আন্তর্জাতিক ভাষার দক্ষতা জরুরি।

(vii) **আন্তঃসাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন:** ভাষা মানুষের সম্পর্ক গড়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। আন্তর্জাতিক ভাষা জানা থাকলে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করা যায়। ফলে বৈশ্বিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

(viii) **বিশ্বসাহিত্য ও গবেষণা বোঝার সক্ষমতা:** আন্তর্জাতিক ভাষা শেখার মাধ্যমে বিশ্বের সেরা সাহিত্যকর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা সরাসরি পড়ার ও বোঝার সুযোগ পাওয়া যায়।

সুতরাং, আন্তর্জাতিক ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যমই নয়; এটি জ্ঞান, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও পেশাগত জীবনে এগিয়ে থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

চমস্কির ভাষাতত্ত্ব ও 'সর্বজনীন ব্যাকরণ' তত্ত্ব

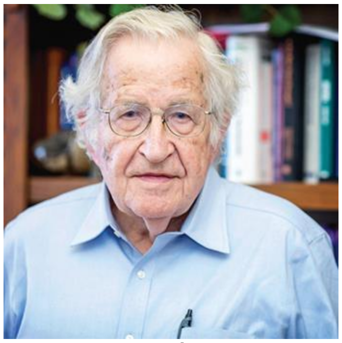

নোয়াম চমস্কিকে 'আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক' বলা হয়। ভাষাবিজ্ঞানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হলো 'সর্বজনীন ব্যাকরণ' তত্ত্ব।

সর্বজনীন ব্যাকরণ তত্ত্ব (Universal Grammar – UG)

(i) মস্তিষ্কে ভাষা শেখার ক্ষমতা জন্মগত। চমস্কি বলেন, প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কে ভাষা শেখার ক্ষমতা প্রাকৃতিকভাবে প্রোগ্রাম করা থাকে।

(ii) ভাষা শেখার প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত, যেমন–

- ঘুমের প্রবণতা, হাঁটার দক্ষতা স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে
- ভাষা শেখার দক্ষতাও স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়

(iii) শিশু জন্মের পর স্বাভাবিক পরিবেশে ভাষা আয়ত্ত করে।

- পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা শুধু মস্তিষ্কের ভিতরে থাকা ভাষাশক্তিকে উদ্দীপিত করে।

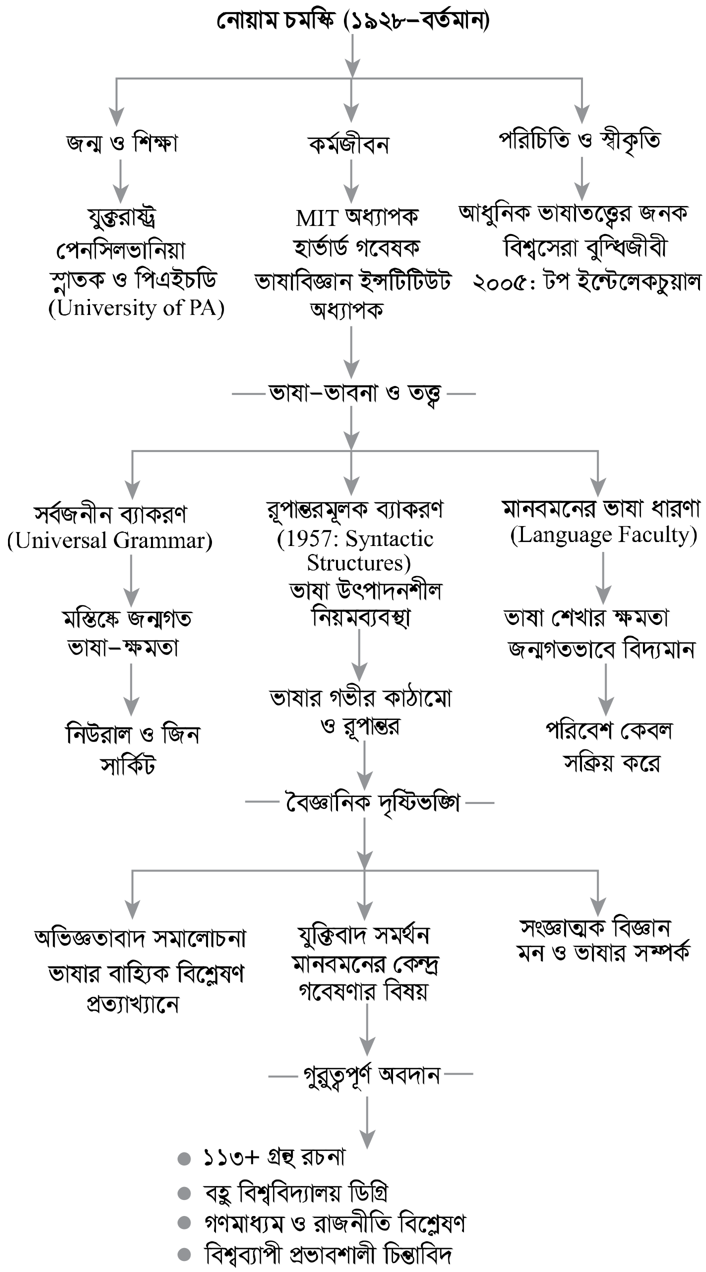

(iv) সব ভাষার মধ্যে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

- বিশ্বের সব ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে সূক্ষ্ম মিল রয়েছে।
- এই মিলগুলোই 'সর্বজনীন ব্যাকরণ'।

(v) ভাষা শেখার পেছনে নিউরাল সার্কিটের ভূমিকা।

- মানব মস্তিষ্কের নিউরাল সার্কিট (Neural Circuit) ভাষা শেখার জন্য বিশেষভাবে তৈরি।
- নিউরাল সার্কিট গঠিত হয় জিন সার্কিটের মাধ্যমে।

চমস্কির 'রূপান্তরমূলক উৎপাদনশীল ব্যাকরণ' তত্ত্ব

১৯৫৭ সালে 'সিন্ট্যাকটিক স্ট্রাকচারস' (Syntactic Structures) গ্রন্থে চমস্কি এই তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এটি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে এক বিপ্লবের সূচনা করে।

ভাষাবিজ্ঞানকে 'মানব মনের গবেষণা' হিসেবে নতুন মাত্রা দেয়।

চমস্কির ভাষাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

১. ভাষার কাঠামোগত গবেষণার পরিবর্তে ভাষার অন্তর্নিহিত নিয়ম বিশ্লেষণ

২. ভাষা শেখার ক্ষমতা মানুষের জিনগত বৈশিষ্ট্য

৩. প্রতিটি মানবশিশু ভাষা শেখার সহজাত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়

৪. ভাষার মূল গঠন মস্তিষ্কে স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়

চমস্কির আগে ভাষাবিজ্ঞানীরা বহিঃস্থ ভাষার কাঠামো বিশ্লেষণ করতেন। কিন্তু চমস্কি বলেন, ভাষা শেখার ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

নোয়াম চমস্কির গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ

চমস্কি ১১৩টিরও বেশি বই লিখেছেন। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য বই–

- The Sound Pattern of English (১৯৬৮)
- Lectures on Government and Binding (১৯৮৭)
- Manufacturing Consent (১৯৮৮)
- Necessary Illusions (১৯৮৯)
- Occupy (২০১২)

তাঁর রচিত বইয়ের ওপর ১৫টিরও বেশি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। কয়েকটি বই বাংলায় অনূদিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ভাষা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নোয়াম চমস্কির 'সর্বজনীন ব্যাকরণ' তত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। ভাষা মানুষের মস্তিষ্কে প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং এটি একটি সহজাত দক্ষতা। ভাষা শেখার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও নিয়ম বোঝার জন্য চমস্কির গবেষণা আজও গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষার সমকালীন প্রয়োগ

ভাষা মানব সভ্যতার বিকাশে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভাষা মানুষকে কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং চিন্তাশক্তি, সামাজিক সংহতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের অগ্রগামী উপাদান হিসেবে গড়ে তুলেছে। আধুনিক যুগে ভাষা তার বহুমাত্রিক কার্যকরিতার কারণে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ভাষা ও প্রযুক্তি: আজকের প্রযুক্তিনির্ভর যুগে ভাষা শুধু মুখে বা কাগজে সীমাবদ্ধ নেই। ভয়েস রেকগনিশন, অনুবাদ সফটওয়্যার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ভাষা অ্যাপ' ভাষার বহুমাত্রিক ব্যবহারকে সহজ করেছে।[৪১] উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষার্থী যিনি বাংলায় গবেষণা করতে চায়, সে অনুবাদ সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার তথ্য সহজে বুঝতে পারে। এছাড়া, কম্পিউটার, মোবাইল অ্যাপ এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ভাষাকে ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সুযোগ দেয়। ভাষার এই প্রযুক্তিগত প্রসার শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের জন্য বিশ্বস্ত তথ্যের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করে।

ভাষা ও সামাজিক পরিবর্তন: ভাষা সমাজের পরিবর্তনের শক্তিশালী মাধ্যম। 'মাতৃভাষার আন্দোলন' এবং 'ভাষার অধিকার সংগ্রাম' সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে।[৪২] উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার জন্য নয়, বরং জাতীয় পরিচয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি প্রমাণ করে, ভাষা কেবল কথ্য বা লিখিত মাধ্যম নয়; এটি সমাজে শক্তি, অধিকার এবং পরিবর্তন আনতে সক্ষম।

৪১. *Ovishake Sen et al., "Bangla Natural Language Processing: A Comprehensive Analysis," arXiv:2105.14875, 2021.*

৪২. *UNESCO, "International Mother Language Day," 2024. (unesco.org)*

ভাষা ও সংস্কৃতি: ভাষা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণকারী। 'লোককথা, গান, প্রবাদ, আচার এবং ইতিহাস' ভাষার মাধ্যমে প্রজন্মান্তরে পৌঁছায়।[৪৩] উদাহরণস্বরূপ, চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন রূপ সংরক্ষণ করে। ভাষার এই সাংস্কৃতিক কার্য মানুষের মানসিক বিকাশ এবং সামাজিক অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। ভাষা হারালে শুধু শব্দ হারাবে না; হারাবে মানুষের ইতিহাস, চিন্তা ও জীবনধারার প্রেক্ষাপট।

ভাষা ও শিক্ষা: শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষা অপরিহার্য। 'গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নৈতিকতা'– সবই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী পর্যন্ত পৌঁছায়।[৪৪] মাতৃভাষায় শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান আরও সুসংগঠিতভাবে অর্জিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিশু যখন বাংলায় প্রথম গণিত বা বিজ্ঞান শিখে, তখন তার চিন্তার প্রক্রিয়া আরও গভীরভাবে বিকশিত হয়। ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান সংরক্ষণ, বিতরণ এবং নতুন প্রজন্মকে সক্ষম করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে।

ভাষা ও মানসিক বিকাশ: ভাষা মানুষের চিন্তাশক্তি, কল্পনা এবং সৃজনশীলতার বিকাশে সহায়ক। 'কবিতা লেখা, গল্প রচনা, নাটক পরিচালনা, আবেগ প্রকাশ'– এসব ভাষার মাধ্যমে সম্ভব।[৪৫] উদাহরণস্বরূপ, সাহিত্য এবং নাট্যকলার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শুধু ভাষা শেখে না, বিশ্লেষণ, সমালোচনা এবং ভাবনার গভীরতা অর্জন করে।

ভাষা সংরক্ষণ ও বৈচিত্র্য: ভাষা হারালে সমাজ ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। 'UNESCO ভাষা সংরক্ষণ প্রকল্প' অনুসারে, বিশ্বের বহু ভাষা বর্তমানে বিপন্ন এবং হারিয়ে যাচ্ছে।[৪৬] ভাষার মৃত্যু সমাজের ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং স্থানীয় জ্ঞান হ্রাস করে। এই কারণে শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষার মূল্য বোঝা, সচেতন থাকা এবং ভাষার ব্যবহার ও সংরক্ষণে অংশ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষা আজকের সভ্যতার প্রতিটি স্তরে অনিবার্য। এটি প্রযুক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং মানসিক বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু। ভাষা মানুষের চিন্তা ও অনুভতির বাহন, ইতিহাস ও জ্ঞানের সংরক্ষক এবং সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী উপাদান। আধুনিক যুগে ভাষার ব্যবহার ও সংরক্ষণ শিক্ষার্থী, গবেষক এবং সমাজের সকলের জন্য অপরিহার্য।

ভাষাক্রম: বিশ্বভাষা থেকে স্থানীয় ভাষা

ভাষা মানুষের ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম। পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৭,০০০টিরও বেশি জীবিত ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এসব ভাষা ব্যবহারকারী, মর্যাদা, কার্যপরিধি ও ভৌগোলিক বিস্তৃতির ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। ভাষাবিজ্ঞানীরা এই স্তরবিন্যাসকে ভাষাক্রম (Hierarchy of Languages) বলে থাকেন।

প্রধান ভাষাপরিবারসমূহ

১. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবার: এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ভাষাপরিবারগুলোর একটি। ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ ভাষা এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, ফরাসি, জার্মান, রুশ, স্প্যানিশ ও ইতালীয় ভাষা এ পরিবারের সদস্য। বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ইন্দো-ইরানীয় শাখার ভারতীয় আর্য উপশাখাভুক্ত।

২. সিনো-তিব্বতীয় ভাষাপরিবার: চীন, তিব্বত, মিয়ানমার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অঞ্চলে এই ভাষাপরিবারের বিস্তার দেখা যায়। বিশ্বের সর্বাধিক মাতৃভাষাভাষীর ভাষা ম্যান্ডারিন চীনা এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আফ্রো-এশীয় ভাষাপরিবার: উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার বহু ভাষা এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আরবি ও হিব্রু এর উল্লেখযোগ্য ভাষা। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা আরবি হওয়ায় এর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

৪. দ্রাবিড় ভাষাপরিবার: দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষাগুলো– তামিল, তেলুগু, কন্নড় ও মালয়ালম– দ্রাবিড় পরিবারের অন্তর্গত। এই ভাষাগুলোর ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ সাহিত্যভান্ডার রয়েছে।

৫. অস্ট্রোনেশীয় ভাষাপরিবার: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এই ভাষাপরিবারের বিস্তার দেখা যায়। মালয়, ইন্দোনেশীয় ও টাগালোগ এর গুরুত্বপূর্ণ ভাষা।

---

৪৩. *Suniti Kumar Chatterji, The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta University Press.*

৪৪. *Encyclopaedia Britannica, "Language and Education," 2023. (britannica.com)*

৪৫. *Jack Goodz, The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge University Press, 1986.*

৪৬. *UNESCO, "World Atlas of Languages," 2024. (unesco.org)*

অধ্যায় ১
পরিচ্ছেদ ২ বাংলা ভাষার পরিচয়

সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব

ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, আনুমানিক ৫৫০০ বছর পূর্বে মধ্য ইউরোপ থেকে দক্ষিণ-পূর্বাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে একটি মানবগোষ্ঠী বাস করত। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী একই অঞ্চলে বাস করত বলে তাদের ভাষা ছিল প্রায় অভিন্ন। ভাষাটি ইন্দো-ইউরোপিয়ান বা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা নামে পরিচিত। অধ্যাপক হেনরি সুইটের মতে, খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০০ অব্দে মানুষ হিন্দু-ইউরোপিয়ান ভাষায় কথা বলত। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে এই ভাষায় মানুষ মনোভাব প্রকাশ করত। ভাষাটির মূল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তা যে পূর্ব-ইউরোপ কিংবা মধ্য-এশিয়ার পশ্চিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার কোনো একটি অঞ্চলে ছিল, সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। নানা কারণে এ অঞ্চলের মানুষ ইউরোপের অন্যান্য অংশসহ এশিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তার একটি দল ভারতবর্ষে এসে বসতি স্থাপন করে। এরা আর্য জাতি নামে পরিচিত হয়। আর্য জাতি যে ভাষায় কথা বলত সেটি আর্য ভাষা। তারা ভারতবর্ষে এসে এখানকার প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষা ও তাদের ভাষা সংস্কার করে কথা বলার জন্য একটি প্রমিত ভাষা গ্রহণ করে, যা সংস্কৃত ভাষা নামে পরিচিত। সংস্কৃত মানে যা সংস্কার করা হয়েছে।

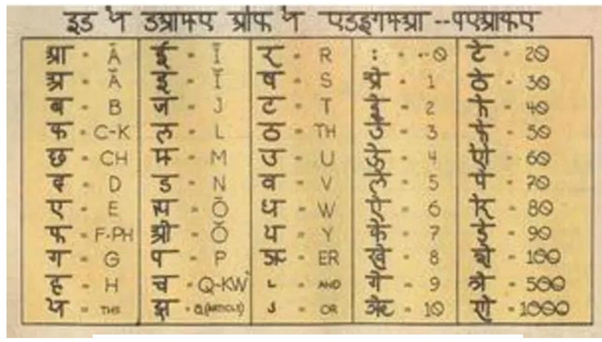

সংস্কৃত ভাষার লিপি

পালি ও বাংলা

প্রাচীন ভারতবর্ষে সর্বসাধারণের কথ্য ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত একাধারে লিখিত ও কথ্য ভাষারূপে ভারতের নানা স্থানে এ প্রাকৃত ভাষাসমূহ প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা প্রাকৃত থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি। ধারণা করা হয়, প্রাচীন ভারতের প্রাকৃত ভাষাগুলোর মধ্যে পালি অন্যতম, যার জন্ম যিশুখ্রিষ্টের জন্মেরও কমপক্ষে ছয়শ বছর আগে। পালি ছিল মধ্য বিহারের মগধ অধিবাসীদের ভাষা। পালি কথ্য ভাষা হলেও তার সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ ছিল এবং তাতে কাব্য, নাটক ইত্যাদি রচিত হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধ এ ভাষাতেই ধর্ম প্রচার করেছিলেন। একটি সাধারণ প্রাদেশিক ভাষা হয়েও গৌতম বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের কারণে এটি শক্তিশালী ভাষা হয়ে উঠেছিল, যা তাকে বসিয়েছে চিরায়ত ভাষার আসনে। সংস্কৃতের সঙ্গে পালির সম্পর্ক অনেকটা বোনের মতো। পালি এবং সংস্কৃতের সম্পর্ক নিবিড় হলেও পালি আর্য ভাষার সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন একটি ভাষা-শাখা। তবে সংস্কৃতভাষীরা পালিবিরোধী ছিল। তাই প্রচুর ঐতিহাসিক নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও পালি তার যথাযথ মর্যাদা পায়নি। সংস্কৃতের বিরোধিতার কারণে কোনো গবেষক ও ভাষাতাত্ত্বিকদের নিকটও পালি অনেকটা অপরিচিত থেকে যায়। এভাবে সংস্কৃতের মতোই পালিরও মৃত্যু ঘটে। বর্তমানে পালি কেবল সাহিত্যিক ও ধর্মীয় ভাষা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

অপভ্রংশ

মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা পালি-প্রাকৃতের শেষ স্তর হলো অপভ্রংশ। 'অপশব্দ' বা 'অপভ্রষ্ট' শব্দ থেকে 'অপভ্রংশ' শব্দের উদ্ভব। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ পতঞ্জলির মহাভাষ্য গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'অপভ্রংশ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত কিছু অশিষ্ট শব্দকে নির্দেশ করার জন্য অপভ্রংশ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পতঞ্জলি যাকে অপভ্রংশ বলতেন, বর্তমানে তা পালি ও প্রাকৃত ভাষা নামে পরিচিত।

বঙ্গ, বাংলা, বাংলাদেশ নামের উদ্ভব: বাংলাদেশের নামকরণ

বাংলাদেশ প্রাচীন হলেও ইতিহাস অত প্রাচীন নয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে মহাবীর আলেকজান্ডার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। মূলত তখন হতে উপমহাদেশে ঐতিহাসিক যুগের সূচনা। প্রাচীনকালে গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে গঙ্গারিডি নামের একটি রাজ্য ছিল। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান ইতিহাসবেত্তাদের বিবরণ বিশ্লেষণে জানা যায়, গঙ্গারিডি রাজ্যটি ছিল বর্তমান বাংলাদেশ। সুতরাং জানামতে, বাংলাদেশের প্রাচীন নাম গঙ্গারিডি। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে প্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌধায়ন ধর্মসূত্র অনুযায়ী এটি ছিল সর্বনিকৃষ্ট অঞ্চল। তাই নাম বঙ্গ।

সাধারণত পন্ডিতরা গঙ্গা বিধৌতপূর্ব তীরবর্তী দ্বীপ অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক এলাকাকে প্রাচীন গ্রিক-রোমান ঐতিহাসিকদের গঙ্গারিডি রাজ্য বলে অনুমান করা হয়। পূর্বে এ ভূখণ্ড বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ়, গৌড়, সমতট, হারিকেল প্রভৃতি

সুনির্দিষ্ট জনপদে বিভক্ত ছিল। ‘বঙ্গা’ নামের উৎপত্তি নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। ঋগ্বেদে ‘বঙ্গা’ নামের উল্লেখ নেই। ‘ঐতরেয় আরণ্যক’ গ্রন্থে প্রথম বঙ্গা নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘বৌধায়ন ধর্মসূত্রে’ সর্বনিকৃষ্ট অঞ্চল রূপে বঙ্গোর নাম করা হয়েছে। রামায়ণে অযোধ্যার সঙ্গো মিত্রতা প্রতিষ্ঠাকারী দেশের তালিকায় বঙ্গা দেশের উল্লেখ রয়েছে। কালীদাসের রঘুবংশে বলা হয়েছে, রঘু সুক্ষদের পরাজিত করে বঙ্গাদের পরাজিত করেন। শক্তি সঙ্গা মতন্ত্রে’র ষটপঞ্চাশ দেশ বিভাগে রত্নাকরম বা সাগর হতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূখণ্ডকে বঙ্গা হিসেবে বিধৃত করা হয়েছে। আনুমানিক দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং মিলিন্দপনহো (আনু. খ্রিস্টাব্দ এক ও দুই শতক) প্রদত্ত তথ্যে বঙ্গোর অন্তভক্ত এলাকা সমুদ্র তীরবর্তী ছিল বলে জানা যায়। চৈনিক গ্রন্থ (খ্রিস্টাব্দ তিন শতক)-তে বঙ্গাকে বা গঙ্গাার একটি দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রের বঙ্গোর প্রাচীন উল্লেখ:

১. আর্যপূর্বে বঙ্গা	২. ঐতরেয় আরণ্যক বঙ্গা	৩. রামায়ণ বঙ্গা
৪. মহাভারত বঙ্গা	৫. শক্তি সঙ্গামতন্ত্র বঙ্গা	৬. শতপথ ব্রাহ্মণ বঙ্গা
৭. পতঞ্জলি বঙ্গা	৮. কাশ্যপ বঙ্গা	৯. আর্যভট্ট বঙ্গা
১০. বরাহ্ মিহির বঙ্গা	১১. ব্রহ্মগুপ্ত বঙ্গা	১২. শ্রী সেন বঙ্গা
১৩. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বঙ্গা	১৪. বৌধায়ন ধর্মসূত্র বঙ্গা	১৫. রঘুবংশ বঙ্গা

তিব্বতীয় মতে, বান্স (bans জলময় স্যাঁতসেঁতে) থেকে ‘বঙ্গা’ শব্দের উৎপত্তি। পুরাকালে এ অঞ্চল নদীবহুল ও জলময় ছিল। এ কারণে তিব্বতীয় bansevban থেকে ‘বঙ্গা’ শব্দের উদ্ভব অসম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, নামটির মূলে ছিল চীন-তিব্বতী গোষ্ঠীর শব্দ। তারা শব্দটির ‘অং’ অংশের সঙ্গো গঙ্গাা, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ইত্যাদি নদীর নামের ‘অং’ অংশের সমত্ব ধরে অনুমান করেছেন যে, শব্দটির মৌলিক অর্থ ছিল জলাভূমি। আড়াই-তিন হাজার বছর পূর্বে বাংলাদেশের বেশির ভাগই জলাভূমি ও জঙ্গাল ছিল। সংস্কৃত ভাষায় ‘বঙ্গা’ শব্দটি মূলত বং বা বঙ্গা গোষ্ঠীর নাম। এই গোষ্ঠীর নাম থেকে ‘বঙ্গা’ একটি অঞ্চলের নাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মালয় ভাষায় ‘বাঙ’ মানে ভাই। এই উৎস হতেও ‘বঙ্গা’ নামটি হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

‘বঙ্গা’-এর নামকরণে কয়েকটি কিংবদন্তি রয়েছে। সিরাজুস সালাতি নদ গ্রন্থে আছে, হজরত নুহ্ (আঃ) মহাপ্লাবনের ধ্বংস হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে নতুন করে মানব বসতি স্থাপনের জন্য পুত্র ‘হাম’-কে পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীর দক্ষিণ অংশে। হামের পুত্র ছিল ‘হিন্দ’, তিনি এসে ভারত অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। মনে করা হয়, এই হিন্দের নাম থেকেই ভারতবর্ষের নাম হয় ‘হিন্দুস্থান’। হিন্দের দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল ‘বঙ্গা’, কেউ কেউ বলেন ‘বং’। এই বঙ্গা নাম থেকে ‘বঙ্গা’ নামের ভূখণ্ডটির নাম রচিত। মহাভারতের আদি পর্বে উল্লেখ আছে, বলিরাজা গঙ্গাায় ভাসমান ঋষি দীর্ঘতমাকে দেখতে পেয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন এবং সন্তান উৎপাদনের জন্য নিজ স্ত্রী সুষ্ণোকে ঋষির কাছে প্রেরণ করেন। তখন ঋষি দীর্ঘতমা রানিকে বলেন যে, তার অঙ্গা, বঙ্গা, কলিঙ্গা, পুণ্ড্র ও সুক্ষ নামে পাঁচটি তেজস্বি পুত্র হবে এবং তাদের প্রত্যেকের নামে এক একটি দেশ নামাঙ্কিত হবে। বঙ্গোর নামানুসারে এর অধিকৃত রাজ্য ‘বঙ্গা’ নামে অভিহিত হয়।

৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে রাষ্ট্র কুটরাজা তৃতীয় গোবিন্দের নেসারি তাম্রশাসনের উচ্চারণগত দিক থেকে বঙ্গা শব্দের প্রায় অভিন্ন বঙ্গাল শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাচর্যবি নিশ্চয় গ্রন্থে ভুসুক পার একটি শ্লোকে (খ্রিষ্টাব্দ দ্বাদশ/তেরো শতক) ‘বঙ্গা’ এবং ‘বঙ্গালি’ দুটোরই উল্লেখ আছে। সেমিটিক ভাষায় ‘আল’ অর্থ আওলাদ, সন্তান বা বংশধর। সুতরাং (বঙ্গা + আল) বঙ্গাল হচ্ছে ‘বঙ্গা’-এর সন্তান বা বংশধরগণ। গবেষক ডি. সি সরকার বলেন, বঙ্গাল শব্দটির উৎপত্তিতে বঙ্গা-এর সাথে প্রকৃত প্রত্যয় ‘আল’ যুক্ত হয়েছে। কারণ বঙ্গাল ছিল বঙ্গোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। গ্রিয়ারসন মত প্রকাশ করেছেন, “বঙ্গাল এসেছে বঙ্গা + আলয় থেকে এবং এর অর্থ বঙ্গাদের বাসভূমি।” সুকুমর সেন বলেন, “বঙ্গাল এসেছে বঙ্গাপাল থেকে (বঙ্গো বসবাসকারী জনগোষ্ঠী)।” তবে বঙ্গাল নামের উদ্ভবের কোন ব্যাখ্যাটি সঠিক সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গো রিজিয়া রহমান তার বং থেকে বাংলা নামক উপন্যাসে লিখেছেন, সুদূর অতীতে বং এবং এলা নামক দুই মানব-মানবী সর্বস্ব হরিয়ে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে উপস্থিত হয় এবং এখানে বসতি গড়ে তুলেন। কালক্রমে বং এবং এলার বংশধরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গোত্র ‘বঙ্গাা’ (বং + এলা) গোত্র নামে পরিচিত হয়। এই বঙ্গাল গোত্র থেকে বঙ্গাল নামের উদ্ভব। তবে এটি নিছক কাহিনি।

সম্রাট আকবরের দরবারের ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজল আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন, এদেশের প্রাচীন নাম বঙ্গা বাবাং। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বঙ্গা থেকে বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে। আবুল ফজল

বলেন, প্রাচীনকালে বাংলার রাজাগণ দশ গজ উঁচু এবং বিশ গজ চওড়া প্রকান্ড আল বা বাঁধ নির্মাণ করতেন। সম্ভবত বাহিরাক্রমণ থেকে দেশকে সুরক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থানে মাটির তৈরি ছোটো ছোটো পাহাড়ের ন্যায় দুর্গ প্রাচীর প্রস্তুত করা হতো। এ সমস্ত বাঁধের পাশে খাল বা নালায় মানুষ যাতায়াত করার জন্য সাঁকো নির্মাণ করা হতো। এ কারণে 'বঙ্গ' ও 'আল' এই দুটি শব্দের (বঙ্গ + আল = বঙ্গাল) সংমিশ্রণে ক্রমশ 'বাঙ্গালা' নামের উৎপত্তি হয়েছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেছেন, "খ্রিষ্টীয় আট শতকে এবং সম্ভবত আরও প্রাচীনকাল থেকে বঙ্গ এবং বঙ্গাল দুটি পৃথক দেশ ছিল এবং অনেক প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থে এ দুটি দেশের একত্র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গ নামের সঙ্গে আল যোগে অথবা অন্য কোনো কারণে বঙ্গাল অথবা বাংলা নামের উদ্ভব হয়েছে, এটা স্বীকার করা যায় না।

তবে একটি বিষয়ে ইতিহাসবেত্তাদের মতৈক্য লক্ষ করা যায়, বঙ্গাল দেশের নাম থেকে কালক্রমে 'বাংলা' নামের উদ্ভব হয়েছে। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রথমদিকেও এ অঞ্চলকে 'বঙ্গ' নামে অভিহিত হতো। খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ শতকে; বিশেষ করে, সুলতান শামস উদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমল থেকে বাংলাভাষী সমগ্র ভূখন্ড (বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ) রাজ্য নাম হিসেবে বাঙ্গালাহ্ হিসেবে পরিচিত ছিল। মুসলিম শাসনামালের গোড়ার দিকে বঙ্গ বা বাঙ্গালা বলতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বোঝাত। ইলিয়াস শাহ লখনৌতি, সাতগাও এবং সোনারগাঁও একত্রিত করার পর শামস-ই-সিরাজ ইলিয়াস শাহ্কে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ্', 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ্' এবং 'শাহ-ই-বাঙালিয়ান' হিসেবে উল্লেখ করেন।

সম্রাট আকবরের সময়ে এ অঞ্চলে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মোগলরা বাঙ্গালাহকে মোগল সাম্রাজ্যে একটি সুবাহ্ বা প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তখন পুরো প্রদেশ সুবাহ্-ই-বাঙ্গালাহ্ নামে পরিচিতি লাভ করে। ষোলো শতক হতে ইউরোপীয়রা বাংলায় আসতে শুরু করে। ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগিজরা প্রথম ভারতে আসে এবং তারা এ ভূখন্ডকে 'Bengala' নামে অভিহিত করে। পরবর্তী কালে মোগল 'সুবাহ্ বাংলা' ইংরেজদের অধিকারে যাওয়ার পর তারা প্রথমে 'Bengala' বা 'Bengala' বললেও পরে 'Bengala' নামেই পরিচিতি পায়। বিভিন্ন আমলে বাংলার পূর্ব নামের রূপ নিচে দেখা যায়। যেমন–

- দ্রাবিড় সাহিত্য– পাঙ্গালা
- মার্কোপোলো– বেঙ্গালা
- মিনহাজ-ই-সিরাজ– বঙ্গ
- শামস-ই-সিরাজ– বাঙ্গালাহ্
- ভারথেমা– বাংঘেলা
- চীনা– মানচালা
- পর্তুগিজ– বেঙ্গালা
- জৈন গ্রন্থ– বজ্জভূমি
- মাহুয়ান– পাংকোলো
- জিয়া-উদ-দীন-বরনী– বঙ্গালাহ/বলগাকপুর
- আইন-ই-আকববি– বঙ্গালাহ্
- ভাস্কো-দা-গামা– বেনগুয়েলা
- আরব-তুর্কি– বানজালা
- ইংরেজ– বেঙ্গাল

ইংরেজ শাসনামলে এই অঞ্চল বেঙ্গাল বা বাংলা নামেই পরিচিত হয়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গাভঙ্গ হলে এই অঞ্চল 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' (Eastern Begnal & Assam) নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রবল আপত্তিতে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গাভঙ্গ রদ হলে ভূখণ্ডটি আবার পূর্ব নাম বাংলা ফিরে পায়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ভাগ হলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর পূর্ব বাংলা নাম পরিবতর্ন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' রাখা হয়। 'বাংলা'র সঙ্গে 'দেশ' যোগ করে এ দেশের নাম হয়েছে বাংলাদেশ।

প্রশাসনিক পটভূমি

আনুমানিক ১৫০০-৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আর্যদের আগমনের সময়ে বঙ্গের অধিকাংশ এলাকাই ছিল অরণ্য ও জলাশয়। তখন প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতির লোকেরা ছিল এখানকার অধিবাসী। এরা পরবর্তীকালে বৈদিক নামে পরিচিতি লাভ করে। নদীমাতৃক ও অরণ্যবেষ্টিত থাকার ফলে বঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো আর্য-ক্ষমতার বাইরে ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম–৬ষ্ঠ অব্দে রামায়ণের যুগে বঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি ছিল এই অঞ্চলের প্রধান জনপদ। পূর্বাঞ্চলে অঙ্গ নামের আর একটি জনপদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

মৌর্য যুগ পূর্ব বাংলার প্রশাসন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রাচ্য, উত্তরাপথ, অবন্তী ও দক্ষিণাপথ নামের চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। সম্রাট অশোকের সময় কলিঙ্গ নামের একটি প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাটালীপুত্র, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি ও তোসালি ছিল প্রদেশগুলোর রাজধানী, গুপ্ত আমলে প্রশাসনিক এককসমূহ ভুক্তি (বিভাগ), বিষয়

(জেলা), মন্ডল, বীথি (মহাকুমা) ও গ্রাম প্রভৃতি নামে বিভক্ত ছিল। উত্তরাঞ্চলে ভুক্তি এবং দক্ষিণাঞ্চলের মন্ডলগুলো নাড়ু ও কোট্রম এককে বিভক্ত ছিল। দেশসমূহের মধ্যে সৌরাষ্ট্র, সুকুলিদেশ এবং ভুক্তিসমূহের মধ্যে পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি, বর্ধমান ভুক্তি, শ্রাবস্ত্রী ভুক্তি প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পাল রাজাগণ প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র বাংলা, বিহার ও আসাম শাসন করতেন। এ কারণে এ যুগে বহু ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ভুক্তিগুলোর মধ্যে পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি, বর্ধমান ভুক্তি, দন্ড ভুক্তি (মেদেনীপুর), প্রাগজ্যোতিষ ভুক্তি (আসাম), শ্রীনগর ভুক্তি (বিহার) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পাল পরবর্তী সেন আমলে আগের ভুক্তি ছাড়াও আরও কিছু নতুন নামের শাসন এলাকার পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলোর মধ্যে টক, চতুরক, আবৃত্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে আনুমানিক ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলায় মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার ব্যাপক অংশ জুড়ে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অঞ্চলটি দিল্লি সালতানাতের প্রদেশ হিসেবে শাসিত হয়। এ সময় সুলতানি সাম্রাজ্য ছিল কতকগুলো সামরিক অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলগুলোকে বলা হতো ইক্তা। ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করলে এই মুসলিম রাজ্যের নাম হয় লখনৌতি। বলবান শাসকরা লখনৌতির নাম দেন ইকলিম লখনৌতি। পূর্ববঙ্গের যে অংশ তাদের রাজ্যভুক্ত ছিল তার নাম ছিল আরস্‌হ বঙ্গালহ্। মুহম্মদ বিন-তুঘলক বাংলা জয় করলে তিনি বাংলাকে লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও-এই তিনটি ইক্তায় বিভক্ত করেন। স্বাধীন সুলতানি আমলে (১৩৩৮–১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) এই ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই সময় সমগ্র বাংলাদেশ লখনৌতি নামে পরিচিত না হয়ে 'বঙ্গালহ্' নামে পরিচিতি পায় এবং রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগগুলো ইক্তার পরিবর্তে 'ইকলিম' নামে অভিহিত হয়। বঙ্গালহ্ রাজ্যে 'মহাল' নামের অনেকগুলো রাজস্ব অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, কয়েকটি মহাল নিয়ে এক একটি 'শিক' গঠিত হতো। 'শিকদার' নামের কর্মচারীরা এর ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

মোগল আমলে বাংলা রাজ্য পুনরায় দিল্লি সাম্রাজ্যের একটি 'সুবাহ্' হিসেবে শাসিত হতে থাকে। ব্রিটিশ আমলের বাংলা প্রদেশ অপেক্ষা সুবাহ্ বাংলার আয়তন অনেক বড়ো ছিল। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে সুবাহ্ বাংলার ১৯টি সরকার এবং ৬৮৮টি মহাল বা পরগনার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ণিয়া ও ভাগলপুর জেলার কিছু অংশ এবং বর্তমান সিলেট জেলা সুবাহ বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। চট্টগ্রাম জেলা প্রথমে আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তা সুবাহ্ বাংলার অধীনে চলে আসে। শেরশাহ্ তাঁর শাসনামলে সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে এবং প্রত্যেকটি সরকারকে আবার বহুসংখ্যক পরগনায় ভাগ করেন। মুর্শিদকুলি খাঁ উড়িষ্যা থেকে মেদেনীপুর পৃথক করে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর বাংলার নিয়ন্ত্রণ কার্যত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যায়। ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ আগস্ট মোগল সম্রাট বাংলা সুবাহ্ দেওয়ানি অধিকার প্রদান করলে তাদের অবস্থান আরও মজবুত হয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীন ভারতের সমগ্র এলাকায় প্রশাসনকে একটি একক কাঠামোর আওতায় আনা হয়। ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ অধিভুক্ত ভারত ১২টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এ সময় বাংলা, বিহার, উত্তর-পূর্ব উড়িষ্যার একাংশ, গোটা আসাম এবং আরাকানের ক্ষুদ্রাংশ বেঙ্গাল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি আদিবাসী রাজ্য বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এরপর বাংলাকে ক্রমশ ছোটো করে আনা হয়েছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ছোটো নাগপুরে। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আসাম প্রদেশকে একজন চিফ কমিশনারের শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হয়। একই সময়ে সিলেট, কাছাড়, গোলপাড়া জেলা ও গারো হিলস জেলার উত্তর অংশকে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে মধ্য প্রদেশের চিফ কমিশনার স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার শাসনকার্যের সুবিধার্থে বাংলাকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা পেশ করেন। লর্ড কার্জন প্রস্তাবের যৌক্তিকতা মেনে নেন এবং ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী (দার্জিলিং বাদে) বিভাগসমূহ এবং মালদা জেলাকে আসামের সঙ্গে একত্র করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। নবগঠিত এ প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা এবং সহায়ক সদর দপ্তর চট্টগ্রাম। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কলকাতাকেন্দ্রিক প্রবল হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভের মুখে ব্রিটিশ সরকার (লর্ড হার্ডিঞ্জ) ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হন। এ পর্যায়ে প্রধানত বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী নিয়ে বাংলা প্রদেশ এবং আসামকে একটি পৃথক প্রদেশ করা হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ফলে বিহার ও উড়িষ্যা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয় এবং ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভক্ত হলে বাংলাও ভাগ হয়ে যায়। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের এবং পশ্চিম বাংলা ভারতের অংশে

পড়ে। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ নামে পরিচিত এই বিভাগ ছিল মূলত সম্প্রদায়গত আবাসভিত্তিক। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা ও থানাগুলো পাকিস্তানভুক্ত হয়।

১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই পাকিস্তানে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দুটি প্রদেশে গঠন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিট প্রদেশ বাতিল করে পূর্বেকার চারটি প্রদেশ পুনরুজ্জীবিত করা হয়। ভাষার প্রশ্ন নিয়ে অতিরিক্ত জটিলতা দেখা দেয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য জাতিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভক্ত করে ফেলে এবং এদেশের জনগণ নিজেদের একটি স্তন্ত্র আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয় এবং পরিণতিতে একটি রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বাংলা ভাষার বিকাশ, শ্রীবৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন

বাংলা ভাষার উদ্ভবের পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সূত্র, ভাষা ও ব্যবহারের প্রভাবে দীর্ঘকাল ধরে এর প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। সেগুলো হলো (ক) প্রাচীন বাংলার ভাষারূপের সঙ্গে কিছু সংস্কৃত প্রভাব প্রথম থেকেই যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কারণ খ্রিষ্টীয় প্রথম অব্দ থেকে সংস্কৃত ভাষা ছিল প্রায় সমগ্র ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার প্রধান বাহন। পালি ও অর্ধ-মাগধী ছিল যথাক্রমে বৌদ্ধ ও জৈনদের নিজ নিজ ধর্মীয় আলোচনা ও সংস্কৃতির বাহন। প্রাচীন বাংলার যুগে বাংলাভাষী অনেকেই কাব্যচর্চা করতেন সংস্কৃত ভাষায়। ভারতের ইন্দো-আর্য ভাষা যখন প্রাচীন ও মধ্যস্তর উত্তীর্ণ হয়ে আধুনিক স্তরে পৌঁছে, তখন বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর প্রভাব সত্ত্বেও [পাল রাজত্বে গৌড় সাম্রাজ্যের পত্তন সত্ত্বেও] সুপ্রসিদ্ধ বাঙালি কবিগণ (জয়দেব, উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য প্রমুখ) সংস্কৃতেই কাব্য রচনা করেছেন। ফলে প্রাচীন যুগ থেকে তৎসম ও অন্যান্য প্রভাব বাংলায় স্থায়ী হয়ে গেছে; (খ) ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনের পর থেকে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি ও তুর্কি ভাষার প্রভাব পড়তে শুরু করে। (গ) চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে মুসলিম শাসনামলে ফারসি রাজভাষা থাকায় এর মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে এই ভাষাসমূহের প্রভাবে বাংলায় স্থান পায় প্রচুর বিভাষী শব্দ; (ঘ) আবার একই সঙ্গে মুসলমান শাসকগণ ‘জবান-এ-বাংলা’র সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করার ফলে তৎকালীন পন্ডিতদের কথিত ‘গৌড় ভাষার’ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ বাংলায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বেড়ে যায়; (ঙ) ১৬শ শতকে পর্তুগিজদের আনীত শব্দাবলি বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করে [আনারস, আতা, তামাক ইত্যাদি]; (চ) মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসি এবং এর মাধ্যমে আগত শব্দ ও ভাষিক প্রভাব প্রবলভাবে বেড়ে যায়। (ছ) সপ্তদশ শতকে বঙ্গদেশে বিদেশিদের আগমন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগিজ এবং ওলন্দাজ ছাড়াও ফরাসি ও ইংরেজি শব্দের প্রভাবও বাড়তে থাকে [ফরাসি: কার্তুজ, কুপন, ডিপো; ওলন্দাজ: হরতন, ইস্কাবন, ইস্কুরুপ; ইংরেজি: টেবিল, চেয়ার, লাট, জাঁদরেল ইত্যাদি]; (জ) সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকদের কারণে বাংলায় প্রথমবারের মতো গদ্য-ভাষার কার্যকর ব্যবহার শুরু হয়; (ঝ) অষ্টাদশ আর ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ শাসনে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে ইংরেজি ও তার মাধ্যমে অন্যান্য বিদেশি ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষায় যুক্ত হতে থাকে। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর তার প্রধান উইলিয়ম কেরি ও তাঁর সহযোগী বাঙালি পন্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা গদ্য-সাহিত্য রচনার উপযোগী হয়ে ওঠে; (ঞ) পরবর্তী পর্যায়ে ঊনবিংশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে এবং গতি সঞ্চার হয়। তৎসম-তদ্ভব শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে এই ভাষা হয়ে ওঠে সাহিত্যের যথার্থ বাহন; (ট) বিংশ শতকে কথ্য ভাষা লেখ্য সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হয় প্রথম চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেক প্রতিভাবান বাঙালির হাতে।

প্রথম থেকেই কাব্যের ভাষা প্রধান হওয়ায় কবিতার ছন্দ বাংলা ভাষার ক্রমপরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলা ছন্দের বিবর্তনে লক্ষ করা যায় যে, আদি নিদর্শন চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। তখনো যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত পর্যায়ের উদ্ভব ঘটেনি। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে জয়দেব, ‘গীত গোবিন্দম্’ শিরোনামের যে কাব্য রচনা করেন তার ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত হলেও তাতে অক্ষর বৃত্তের আভাস রয়েছে। মধ্যযুগের শুরুতে পয়ারের প্রচলন হলেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দই দীর্ঘকাল বাংলায় প্রধান হয়ে আছে। পরে অন্ত্যমধ্য যুগ থেকে প্রস্বরপ্রধান স্বরবৃত্ত ছন্দের উদ্ভব ঘটে। বিশেষ করে, পদান্ত অ-কারের হলন্ত উচ্চারণরীতি প্রচলিত হওয়ায় শব্দের প্রথমে ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করা শুরু হয়। এ সময় অক্ষরবৃত্তের প্রাধান্য সত্ত্বেও স্বরবৃত্ত ছন্দে লোকসংগীত, ছড়া ইত্যাদি রচিত হতে থাকে এবং ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে স্বরবৃত্ত ছন্দ কাব্যসৃষ্টির অন্যতম উপাদান হয়ে ওঠে।

আধুনিক পর্যায়ের বাংলা ভাষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে গদ্যভাষার লিখন-চর্চা, প্রসার লাভ, উন্নয়ন ও কার্যকর প্রয়োগ। ঊনবিংশ শতকে প্রধানত খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় এবং তৎসঙ্গে স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে বাংলা ভাষার (গদ্য ও পদ্য) ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে।

বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকাশ

বাংলার শব্দভান্ডার: বাংলা ভাষা, দ্রাবিড় ও কোল– এ দুটি অনার্য ভাষা দ্বারা প্রভাবিত একটি নতুন ভাষা। শুধু শব্দসম্ভারে নয়, বাক্য গঠনেও বাংলার এ দুটি ভাষার ওপর প্রবল প্রভাব রয়েছে। বাংলায় প্রচুর অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, দ্বিত্ব শব্দ এবং যৌগিক ক্রিয়া পদের ব্যবহার রয়েছে। এসব ব্যবহার অনার্য প্রভাবজাত। যেখানে কোথাও কোথাও মূল শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনের স্থলে অন্য ব্যঞ্জন বসিয়ে 'ইত্যাদি' বা বহুবচনার্থে মূল শব্দের সঙ্গে যোগ করে পদ সাধন করা হয়; যেমন– ঘড়ি-টড়ি, কাপড়-চোপড়। আবার, একই শব্দ দ্বিতীয় বার ব্যবহার করে পুনরাবৃত্তি বোঝানো হয়। যেমন– টুকটুক্, ভট্‌ভট্, খট্‌খট্, ঝন্‌ঝন, ধাঁধা প্রভৃতি। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সহকারী ক্রিয়া। যেমন– বসিয়া পড়া, ঘুমাইয়া পড়া, লাগিয়া থাকা ইত্যাদি। স্থান নামের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় দ্রাবিড়াদি ভাষার শব্দও যথেষ্ট রয়েছে।

[তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলার নামকরণের ইতিহাস, ড. মোহাম্মদ আমীন]

উপভাষা: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬) বাংলা ভাষার চারটি প্রধান উপভাষা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সেগুলো হলো রাঢ়, বঙ্গ, কামরূপ ও বরেন্দ্র। সুকুমার সেন (১৯৩৯) এর সঙ্গে অতিরিক্ত আরও একটি যোগ করে রাঢ়ি, বঙ্গালি, কামরূপী, বরেন্দ্রী ও ঝাড়খণ্ডী– এই পাঁচটি প্রধান উপভাষা লক্ষ করেন। রাঢ়ি হলো বর্তমানে প্রচলিত প্রমিত বাংলার ভিত্তি, যা দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের এক বৃহৎ অংশে কথিত হয়। বঙ্গালি বলা হয় মূলত অবিভক্ত বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে। বঙ্গালিতে অনেক মধ্যবাংলার বৈশিষ্ট্য বজায় আছে, যা রাঢ়িতে লুপ্ত, যেমন– অপিনিহিত স্বর (= অর্ধস্বর), স্বরোচ্চতা সাম্যের অভাব, -ঙ্গা-তে গ্ ব্যঞ্জনের রক্ষা, নাসিক্য ব্যঞ্জন + ব্যঞ্জন পরম্পরা রক্ষা (চাঁদ-এর বদলে চান্দ)। বঙ্গালিতে ড়ু, ঢ় নেই, চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঘৃষ্ট ধ্বনি না হয়ে উষ্ম (শিস্) ধ্বনিতে পরিণত হয়। তবে সিলেট, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের ভাষা বঙ্গালির সাধারণ রূপ থেকে এতই আলাদা যে, সে ভাষাকে অন্য একটি বা দুটি স্বতন্ত্র উপভাষা হিসেবে গণ্য করা সংগত।

বাংলার সব প্রান্তীয় উপভাষা প্রত্যাশিতভাবেই পার্শ্ববর্তী ভাষাসমূহের সঙ্গে মিশে যায়। প্রত্যন্ত বঙ্গালি ও কামরূপীর সঙ্গে অসমিয়ার, ঝাড়খণ্ডীর সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম বিহারীর এবং কাঁথি অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে ওড়িয়ার ঘনিষ্ঠতাও কিছুটা দেখা যায়। বাংলার সাহিত্যিক উপভাষার মধ্যে গদ্য-উপভাষা প্রাচীনতর সাধু ও আধুনিকতর চলিতে বিভক্ত। এই চলিতেরই প্রমিত রূপ সমগ্র বঙ্গভাষী জনগোষ্ঠীর গদ্য-সাহিত্য রচনা এবং শিক্ষিত শ্রেণির আদান-প্রদান ও রেডিয়ো-টেলিভিশনে ব্যবহৃত উপভাষা। কবিতার সাধু-চলিতে মিশ্র উপভাষাটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ক্রমশ চলিতের দিকে ঝুঁকেছে, যেমন– ১৯৬৫-র মার্চের শেষে সংবাদপত্র সাধু গদ্যকে বর্জন করে চলিত গদ্যকে গ্রহণ করে।

ভাষার রীতি বা রূপ: ভাষার বিবিধ রূপ। বাংলা ভাষার লিখিত রূপ দুটি– সাধু ও চলিত বা কথ্য। এ দুয়ের মধ্যে মূল পার্থক্য ক্রিয়া পদ ও সর্বনামে। চলিত রূপে ক্রিয়া পদ ও সর্বনামগুলো সংক্ষেপিত আকারে লেখা হয়। বিংশ শতকের শুরুতে চলিত ভাষার প্রাধান্য বৃদ্ধি পেলেও সাধু ভাষার ব্যবহার একেবারে ওঠে যায়নি। এ সময়ের সংবাদপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের ভাষায় এবং সরকারি ও যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনায় সাধু বাংলার ব্যবহার অব্যাহত থাকে। চলিত বাংলা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক শিষ্টজনের মুখের ভাষা। তখন প্রচুর সংখ্যক প্রতিভাবান বাঙালি চলিত বাংলায় সাহিত্যচর্চায় নিযুক্ত থাকেন। ফলে বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং বিংশ শতকে বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার মর্যাদা লাভ করে। এসময় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাধু ও চলিত দুটি ভাষার ব্যবহার পাশাপাশি চালু থাকায় বাংলা ভাষায় সৃষ্টি হয় এক অনন্য ভাষিক প্রপঞ্চ দ্বিভাষা (diglossia) পরিস্থিতি। সংক্ষেপিত ক্রিয়া পদ ও সর্বনাম চলিত ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও এ দুই ভাষারূপের প্রকৃত পার্থক্য মেজাজে। তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমানের বাংলা ব্যবহার রীতি এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ভাষা ব্যবহার রীতিতেও এক ধরনের পার্থক্য রয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনের ফলে বাংলা ভাষার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়, যার আন্তঃফলস্বরূপ আধুনিক বাংলায় প্রচুর আরবি, ফারসি ও তুর্কি শব্দ অনুপ্রবেশ করে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে উচ্চ শ্রেণির হিন্দুরাও রাজভাষা ফারসির চর্চা করতেন; ফলে তাঁদের বাংলাও ফারসি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। এখনো যুদ্ধ, কর, আইন, সংস্কৃতি ও কারুবিষয়ক প্রায় ২,০০০-এর বেশি আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে। বিশেষ করে, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভাগের আগে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সাধারণ কৃষিভিত্তিক মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাংলায় এরকম শব্দের সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। অশিক্ষিত বাংলাভাষী হিন্দু ও মুসলমানদের ভাষাতেও পার্থক্য আছে। আবার আত্মীয়বাচক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষিত বাংলাভাষী এই দুই সম্প্রদায়ের ভাষায় একটা ব্যাপক

পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বাংলাভাষী হিন্দুরা আত্মীয়বাচক শব্দ ব্যবহার করে সংস্কৃত ও বাংলা অনুসরণে। অন্যদিকে, মুসলমানরা করে ফারসি, আরবি, তুর্কি ও উর্দুর অনুসরণে (কাকা/চাচা, মা/আম্মা ইত্যাদি)। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের লেখ্য বাংলায় সমতা থাকলেও কথ্য বাংলার ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক তফাত। বাংলাভাষী বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে উপভাষাগত পার্থক্য উল্লেখ করার মতো। বাংলাদেশের সিলেট, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের উপভাষার তফাত অনেক সময় এতটাই বেশি থাকে যে, একে অপরের কথা ঠিকভাবে বুঝতেও পারে না।

ধ্বনি: স্বরস্বনিম স্বরধনি: সংগঠন-বিবৃতি ধ্বনিতত্ত্ব ফোনিম বা স্বনিমের হিসেবে মান্য বা প্রমিত চলিত বাংলায় সাতটি স্বরস্বনিম ই, উ, এ, ও, অ্যা, আ, অ নির্ধারিত। এর প্রত্যেকটির অনুনাসিক উচ্চারণ হয়। ব্যঞ্জন স্বনিম ত্রিশটি। যথা: প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্, ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্, ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ড়্ ঢ়্, ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্, চ্ ছ্ জ্ ঝ্ শ্ র্ ল্ স্ হ্ (স্-কে শ্-এর প্রতিবেশগত রূপান্তর বলা চলে)। অর্ধস্বর চারটি ই্, উ্, এ্, ও্। দীর্ঘ স্বরধ্বনি এ ভাষায় অনুপস্থিত। মান্য বা প্রমিত চলিত বাংলার প্রধান ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলো হলো ক. স্বরোচ্চতা সাম্য, যার ফলে স্বরধ্বনির ঊর্ধ্বতা ঘটে, যেমন– প্যাঁচা পেঁচি (অ্যাএ), নটনটী (অও), লেখালিখি (এই) এবং খোকাখুকু (ওউ); খ. শব্দঋণে বিশেষ প্রতিবেশে শ্-এর স্ পরিণতি এবং বিদেশি শব্দে স্-এর উপস্থিতি; গ. অর্থ নিয়ন্ত্রিত একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া ব্যঞ্জনধ্বনির দীর্ঘত্ব, যেমন– বড়ো → বড্ডো, ছোটো → ছোট্টো। মুখের ভাষার ঋণ করা শব্দের যুক্তব্যঞ্জন সরলীকরণের প্রবণতা, প্রধানত স্বরধ্বনি যোগের মাধ্যমে। প্রস্বর (stress) মূলত শব্দের প্রথম দলে (syllable) এবং অর্থবন্ধ শব্দগুচ্ছের প্রথম শব্দে স্পষ্টতম। বস্তুবাচক প্রশ্নে প্রশ্ন শব্দটির (কে, কী, কেন) ওপর মূল প্রস্বর পড়ে। বাক্যের সুর বা পিচ্ (pitch)-এর সাধারণ ছক হলো উক্তিতে টানা সুর নিচে নামে, প্রশ্নে (হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্নে) টানা সুর ওপরে ওঠে। আবেগের কারণে বা কণ্ঠস্বর দূরে পাঠানোর জন্য কখনো কখনো স্বরধ্বনি দীর্ঘ বা প্রলম্বিত হয় (কীই? যাই!)। কোনো অর্থের ওপর জোর দেওয়ার জন্যও প্রস্বর দেওয়া হয়। যৌগিক বাক্যে সংযোজক শব্দগুলোর ওপর ন্যূনতম প্রস্বর পড়ে।

রূপতত্ত্ব: বাংলার রূপতত্ত্ব মূলত বিভক্তিপ্রধান, যদিও এর বিশ্লেষণাত্মক চরিত্র ক্রমশ বিকশিত হয়েছে এবং ক্রমশ আরও প্রকট হয়ে ওঠছে। এর ক্রিয়ারূপ প্রায় পঞ্চাশটির মতো, যদিও শব্দরূপে বিভক্তি তুলনায় অনেক কম। শব্দ রূপে কারকের অর্থ মূলত তিন ভাবে প্রকাশ করা হয়: বিভক্তি যোগের দ্বারা (গৌণকর্ম সম্প্রদান, সম্বন্ধপদ ও অধিকরণ কারকে), বিভক্তি ও অনুসর্গের সাহায্যে (করণ, নিমিত্ত) এবং বিভক্তি ব্যতীত শুধু অনুসর্গের দ্বারা (অপাদান)। কর্তৃকারক সাধারণভাবে বিভক্তিহীন, তবে 'শ্রেণিগত' কর্তায় প্রাচীন-এ বিভক্তির সীমাবদ্ধ ব্যবহার আছে; যেমন– 'মানুষে এমন কাজ করে না।' অপ্রাণিবাচক গৌণকর্মেও বিভক্তি নেই। মান্য চলিতে গৌণকর্মের বিভক্তি -কে, সম্বন্ধ বিভক্তি -(এ)র, অধিকরণ বিভক্তি-(এ) তে। শব্দের শেষে যে ধ্বনি আছে তাই নিয়ন্ত্রণ করে বিভক্তিটি র বা তে নয়- এতে হবে।

ক্রিয়া: ক্রিয়ার প্রকরণ কিছুটা জটিল। বিভক্তি অনুযায়ী সমাপিকা ক্রিয়ার প্রধান দুটি ভাগ নির্দেশক (indicative) ও অনুজ্ঞাবাচক (imperative)। বাংলায় শুধু তুমি-পক্ষ নয়, সে-পক্ষেরও অনুজ্ঞা (third person imperative) আছে। তুমি-পক্ষের তিন শ্রেণির অনুজ্ঞা সম্ভ্রমার্থক (করুন), সাধারণ (করো) এবং তুচ্ছার্থক (কর)। সে-পক্ষের শুধু সাধারণ আর সম্ভ্রমার্থক (করুক, করুন)। অন্যদিকে তুমি-পক্ষের অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দুই কালেরই হতে পারে (করবেন– করুন, কোরো–করো, কর–করিস্)।

কাল: কালের রূপ ও বিভক্তি: নির্দেশকভাবে কাল আছে তিনটি। যথা: বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। বর্তমান আর অতীতে আছে যথাক্রমে তিনটি ও চারটি প্রকার। যথা: বর্তমানে নিত্য (বলি), ঘটমান (বলছি), পুরাঘটিত (বলেছি); অতীতে সাধারণ (বললাম), ঘটমান (বলছিলাম), পুরাঘটিত (বলেছিলাম) আর নিত্যবৃত্ত (বলতাম)। ভবিষ্যতে শুধু একটি প্রকার সাধারণ (বলব)। ঘটমান ভবিষ্যৎ একটিমাত্র ক্রিয়া পদের হয় না। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সবশেষে পাঁচটি পুরুষ বা পক্ষ-বিভক্তি যুক্ত হয়, সেগুলোকে বলা যায়: আমি-পক্ষ (উত্তম পুরুষ), তুমি-পক্ষ (সাধারণ মধ্যম পুরুষ), তুই-পক্ষ (তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষ), সে-পক্ষ (সাধারণ প্রথম পুরুষ) ও গুরু-পক্ষ (আপনি/তিনি: সম্ভ্রামার্থক মধ্যম ও প্রথম পুরুষ)। এসবের বিভক্তিগুচ্ছ কালভেদে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। প্রকার ও কালবিভক্তি পক্ষ অনুযায়ী বদলায় না, কেবল অন্তস্থ পক্ষ-বিভক্তিই বদলে যায় (বর্তমান কালে -ই, -ও, -ইস্, -এ, **-এন:** বলি, বল, বলিস, বলে, বলেন)। ধাতুর সঙ্গে -আ বিভক্তি যোগ করে অনেক ধাতুকেই প্রযোজক ধাতুতে রূপান্তরিত করা যায়। আবার -আ যুক্ত হয়ে নামধাতুও নির্মিত হয়; যেমন– জানাই, ঘুমাই, নামাই, সাঁতরাই।

ধাতু: বাংলা ধাতু মূলত একদল (monosyllabic) ও দ্বিদল (bisyllabic)। যেমন– বল্, বলা। প্রযোজক ধাতু ও নামধাতু স্বতই দ্বিদল। এর চেয়ে বেশি দলের ধাতুও আছে। যেমন– কলকলা, ঝলমলা, চকমকা প্রভৃতি। অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ চারটি ক্রিয়া বিশেষ্য (বলা), পূর্বক্রিয়া (বলে), সাপেক্ষ সংযোজক বা যদ্যর্থক (বললে) এবং নিমিত্তার্থক (বলতে)। এক ধরনের সমাসের দ্বারা ব্যতিহার ক্রিয়া

তৈরি হয়। যেমন– বলাবলি, ডাকাডাকি, ঘোরাঘুরি, লেখালেখি। যুক্তক্রিয়া তৈরি হয় বিশেষ্য বা বিশেষণের সঙ্গে কর্, হ, মার জাতীয় কিছু ধাতুর সমাপিকারূপ যোগ করে– উপকার করা, ভালো হওয়া, চোখ মারা। যৌগিক ক্রিয়া হয় পূর্বক্রিয়া, কখনো বা নিমিত্তার্থক ক্রিয়ার সঙ্গে বল্, উঠ্, পড়্, ফেল্, থাক্ ইত্যাদি একদল ক্রিয়া যোগ করে– ওঠা, বলে ফেলা, বসে পড়া, হাসতে থাকা ইত্যাদি।

প্রত্যয়: বাংলায় প্রত্যয় যোগ করে পদান্তর ও পদ নির্মাণের ক্ষেত্রটি খুব একটা ব্যাপক নয়। খাঁটি বাংলা প্রত্যয় খুব বেশি নেই, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত প্রত্যয় -তা, -ত্ব, -ইমা ইত্যাদি ঋণ করে পদান্তর করতে হয়। তুলনাত্মক প্রত্যয় (-তর, -তম) এবং পূরণবাচক শব্দসমূহও (প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি) বহুলাংশে সংস্কৃত নির্ভর। তবে বাংলায় কৃৎ-তদ্ধিত প্রত্যয়ের সংখ্যা বেশি না হলেও নির্দেশক (-টা, -টি, -খানা), বৃহদর্থক (কলস), ক্ষুদ্রার্থক (কলসি), আদরার্থক (রামু), অনাদরার্থক (রামা) ইত্যাদি প্রত্যয় বৈচিত্র্যময়।

অন্বয়: বাংলায় পদবিন্যাস সাধারণভাবে বিশেষণ বাঁয়ে, বিশেষ্য ডানে বসে; তেমনই ক্রিয়া বিশেষণ আগে এবং ক্রিয়া পরে বসে। বাক্যের উপাদান ক্রমসাধারণভাবে এরকম: কর্তা + সময়বাচক পদ + স্থানবাচক পদ + গৌণকর্ম + মুখ্যকর্ম + ধরনবাচক পদ + ক্রিয়া। যেমন– 'রহিম রবিবার কলেজে সীমাকে কথাটি কানেকানে বলেছিল।' তবে উপাদানের স্থান অল্প-বিস্তর বদল হয়, তাতে অর্থ ও ব্যঞ্জনায় অদলবদল ঘটে। বাংলায় রুশ, তামিল বা জাপানির মতো ক্রিয়াহীন বাক্য আছে। যেমন– আমার বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশে। ইংরেজি ধরনের কর্ম ভাববাচ্য বাংলায় তেমন নেই, তবে ক্রিয়াকে বিশেষ্যরূপ দিয়ে কর্তার ভূমিকায় বসিয়ে ভাববাচ্য তৈরি বহুল প্রচলিত। যেমন– 'তোমার দেখা হয়েছে? এদিকে চট্টগ্রাম যাওয়া চলে।' বাংলায় প্রশ্ননির্মাণ সাধারণভাবে প্রশ্নবাচক শব্দ যোগ করে হয়। জটিল বাক্যের মধ্যে প্রতিনির্দেশক যুক্ত বা সাপেক্ষ বাক্য নির্মাণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন– 'যখন বৃষ্টি আসবে তখন আমি উপস্থিত থাকব না।'

শব্দভান্ডার: উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া শব্দ বাংলা শব্দভান্ডারের প্রধান উৎস। এই শব্দসমূহের মধ্যে তদ্ভব, তৎসম প্রভৃতির উৎস সংস্কৃত ভাষা। এর সঙ্গে আছে অজস্র অজ্ঞাতমূল বা দেশি শব্দ। এগুলো এসেছে মূলত দ্রাবিড়, অস্ট্রিক বা ভোটবর্মী ভাষা থেকে। এছাড়াও আছে প্রচুর নতুন শব্দঋণ– ফারসি, আরবি, ইংরেজি, পর্তুগিজ ও অন্যান্য ভাষা থেকে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধানের মোট শব্দের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখেছিলেন, তাতে তদ্ভব ৫১.৪৫ শতাংশ, তৎসম ৪৪.০০ শতাংশ, ফারসি-আরবি ৩.৩০ শতাংশ এবং ইংরেজি-পর্তুগিজ ইত্যাদি ১.২৫ শতাংশ। অবশ্য এ পরিসংখ্যান সর্বক্ষেত্রে ঠিক নয়। অধিকন্তু, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে প্রায় দেড় লাখ শব্দ থাকলেও সব উপভাষা মিলিয়ে ব্যবহৃত বাংলা শব্দের সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ।

বাংলা লিপি ও ধ্বনি বিন্যাস পদ্ধতি: বাংলা ভাষায় যে লিপি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তা বাংলা লিপি নামে পরিচিত। প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তিত রূপ কুটিল লিপি থেকে এর উৎপত্তি। ঊনবিংশ শতকের শুরুতে ছাপাখানায় বাংলা লিপি দিয়ে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হয়: হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ A Grammar of the Bengal Language। এতে প্রথম বাংলা টাইপ ব্যবহৃত হয়। এরপর থেকে বাংলা লিপির আকৃতি সুশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্ট হতে থাকে। ছাপাখানায় টাইপের উন্নততর ব্যবহারে, বিশেষ করে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বাংলা লিপির আকৃতি ও প্রকৃতি সুস্থিত হয়ে ওঠে। অক্ষরমূলক (syllabic) আরামিক (Aramic) পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা লিখন পদ্ধতির সামঞ্জস্য রয়েছে। এ পদ্ধতিতে অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে শব্দ তৈরি হয়, আর অক্ষরগুলো তৈরি হয় একটি স্বরধ্বনি বা একটি স্বরধ্বনির সঙ্গে অন্য কোনো ধ্বনির (স্বরধ্বনি, অর্ধ-স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির) সংযোগে।

লিপি উচ্চারণ ও ধ্বনি: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০–১৮৯১) বাংলা লিপির আদর্শায়নের লক্ষ্যে ঋ (ৃ) বর্জন করেন এবং ং ও ঃ চিহ্নকে ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে নিয়ে আসেন। ড়, ঢ় এবং ৎ-কেও তিনি বর্ণমালায় স্থান দেন। বাংলা বর্ণমালা তবু সংস্কৃত বর্ণমালার আদলেই বিন্যস্ত থাকে। সচরাচর এতে বারোটি স্বরচিহ্ন ও ত্রিশটি ব্যঞ্জনচিহ্ন থাকে। মুখে উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে এ চিহ্নগুলো সবক্ষেত্রে মিলে না। দীর্ঘ স্বর ও তার চিহ্ন এবং ঞ্, ণ্, য্, ষ্ ইত্যাদি বর্ণের নির্দিষ্ট উচ্চারণ বাংলায় নেই।

লিপি পদ্ধতিতে হ্রস্ব উ-কার, দীর্ঘ ঊ-কার, আর ঋ-কারের একাধিক বর্ণভেদ (allogragh) আছে, তেমনই আছে বহু যুক্ত ব্যঞ্জন চিহ্ন। বিরামচিহ্নগুলো বেশির ভাগ ইউরোপীয়। কোনো কোনো সময়ে ও স্থানে বাংলা আরবি-ফারসি বা এক বিশেষ ধরনের নাগরী (সিলেটি নাগরী) লিপিতে লেখা হয়েছে। আবার মণিপুরী, বোড়ো ও মৈথিলীও লেখা হয়েছে বাংলা লিপিতে। এখনো বঙ্গভাষী অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায় সাঁওতালি লেখায় বহু বাংলা লিপি ব্যবহার করে।

সাধারণভাবে সংস্কৃত ধ্বনি পদ্ধতির ব্যঞ্জন ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যগুলো বাংলায় রয়ে গেছে। যেমন– অল্পপ্রাণ/মহাপ্রাণ, ঘোষ/অঘোষ, দন্ত্য/প্রতিবেষ্টিত ইত্যাদি। সংস্কৃতের মতোই প্রত্যেক ব্যঞ্জনভিত্তিক অক্ষরে বা ব্যঞ্জনবর্ণ-এককের সঙ্গে অন্তঃস্থায়ী

(inherent) স্বর 'অ' বিদ্যমান থাকে, যদি না সেই ব্যঞ্জনের সঙ্গে অন্য কোনো স্বরধ্বনি যুক্ত হয়। যেমন– 'ক' হলো আসলে ক্ + অ, আবার 'কি' হলো ক্ + ই। কিন্তু তারপরেও সংস্কৃতের ধ্বনি পদ্ধতির সঙ্গে বাংলার রয়েছে কিছু উল্লেখযোগ্য এবং ব্যাপক পার্থক্য।

বাংলায় অন্তঃস্থায়ী স্বর 'অ'-এর উচ্চারণ সংস্কৃতের মতো সর্বত্র সুনির্দিষ্ট ও সুস্থিত নয়। 'অ' কখনো অনেকটা ও-এর কাছাকাছি (অভিশ্রুত ও) রূপে উচ্চারিত হয়। এরকম বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলায় অ-এর উচ্চারণে অস্থিরতার ফলে বাংলা বানানে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তবে ইন্দো-আর্য গোষ্ঠীর অন্যান্য অনেক ভাষার মতোই বাংলায় শব্দের শেষে বলে 'অ' প্রায়শ লোপ পায়। স্বরধ্বনির নাসিক্যভবন স্বাভাবিক ও নিয়মিত। যেমন– সম্মানবাচক তৃতীয় পুরুষের সর্বনাম পদ 'তাঁর'-এর সঙ্গে সাধারণ 'তার'-এর সুস্পষ্ট পার্থক্য ঘটে। সংস্কৃতের মূল 'ড'(ফ) বাংলায় আন্তঃস্বরীয় শব্দের মধ্যে বা শেষে থাকলে 'ড়'(ৎ)-রূপে উচ্চারিত হয় এবং উনিশ শতক থেকে বাংলা লিপিতে এভাবে 'ড়' এবং 'ঢ়' রূপে পৃথক দুটি বর্ণের সংযোজন ঘটে। সংস্কৃতের বর্গীয়-ব (ন) এবং অন্তঃস্থ-ব (া) বাংলা বর্ণমালায় 'ব' রূপেই উচ্চারিত হয়। সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি প্রায়শ দ্বিত্বব্যঞ্জন রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন– বিশ্ব/ [বিশ্‌শ], লক্ষ্মী/ [লোক্‌খিঁ] (যথাক্রমে višvabiššo, laksmilokkhi) ইত্যাদি। সংস্কৃতের য (ু) বাংলায় শব্দারম্ভে উচ্চারিত হয় 'জ' (ফু) রূপে এবং আন্তঃস্বরীয় থেকে লিপি পদ্ধতিতে এর রূপ দাঁড়িয়েছে 'য', কিন্তু তা উচ্চারিত হয় 'জ' হিসেবেই। তাই সংস্কৃতের যম (Yama) বাংলায় লেখা হয় /যম/, কিন্তু উচ্চারিত হয় /জম/ হিসেবে। তিনটি শিসবর্ণ শ, ষ, স-এর উচ্চারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তালব্য –শ হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে, যথা দন্ত্য –স যুক্তবর্ণ হিসেবে থাকলে তার উচ্চারণ ঠিক থাকে; যেমন– আসতে/ [আশ্‌তে], কিন্তু আস্তে/ [আস্‌তে]; তেমনি রাস্তা/ [রাস্‌তা], কাস্তে/ [কাস্‌তে] ইত্যাদি।

উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ব্যতীত বাংলার বিভিন্ন উপভাষার প্রভাব বাংলা ভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে রয়ে গেছে। নির্দিষ্ট কোনো উপভাষী ব্যক্তি ঘরের ভেতরে তার নিজস্ব ভাষা, ঘরের বাইরে সাধারণ্যে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা এবং শিক্ষা বা শিল্প-সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আলোচনায় বাংলা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাহিত্য, শিল্প, নাটক, গণমাধ্যম ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলাই ব্যবহৃত হয়। তবে, ইদানীং স্বল্প পরিমাণে হলেও উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার দেখা যায়।

বাংলা ভাষার ঐতিহ্য

বাংলা পৃথিবীর অন্যতম সুশৃঙ্খল ভাষা। বাংলা ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলা পৃথিবীর ষষ্ঠ ভাষা। প্রায় ৩০ লাখেরও বেশি লোক বাংলা জানেন ও বাংলা ভাষায় কথা বলেন।

উপমহাদেশে কেবল বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভষিত হয়েছেন। বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকার জাতীয় সংগীতের ভাষা বাংলা। বাংলা ভাষায় জাতীয় সংগীত গায় বিশ্বের ১৫০ কোটি মানুষ, যা বিশ্বে সর্বাধিক। চীনা ভাষায় ১৪০ কোটি মানুষ এবং ইংরেজিতে ১০০ কোটি মানুষ।

ইউনেস্কোর (UNESCO) ঘোষণা মতে, "বাংলা পৃথিবীর মধুরতম ভাষা এবং স্প্যানিশ দ্বিতীয় ও ডাচ তৃতীয়। ভাবপ্রকাশ এবং ছন্দ দ্যোতনায় বাংলার মতো মধুর ও সুন্দর ভাষা আর নেই।"

বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকাশ: তথ্যসূত্র: *গ্রন্থপঞ্জি সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৩৯; বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ওই, ১৯৬৪; সুকুমার সেন, ভাষারই তিবৃত্ত (ত্রয়োদশ সংস্করণ), ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৯; হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাঙলা ভাষা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৪-৮৫; SK Chatterji, The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta University, Calcutta, 1926; CP Masica, The Indo-Aryan Languages, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.*

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালিকে যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তার ইতিহাস পৃথিবীতে বিরল। বাংলা ভাষার জন্য আত্মদানের স্মৃতিবিজড়িত দিন একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। দিবসটি প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী যথাসম্মানে পালিত হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা জেলার মাতৃভাষা বাংলা। তাছাড়া, আসামের বরাক উপত্যকা বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চল, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে বাংলা দ্বিতীয় ভাষা। ভারতের সমগ্র জনজাতির নিরিখে বাংলা ভাষার স্থান দ্বিতীয়। এমনকি, সুদূর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের মধ্যে বাংলায় কথা বলার লোক রয়েছে। লন্ডনের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা। পাকিস্তানের করাচি শহরে দ্বিতীয় ভাষা বাংলা, মায়ানমারে বহু বাংলাভাষী রয়েছে। বিশ্বে মোট বাংলাভাষীর সংখ্যা পায় ৩০ কোটি। তার মধ্যে বাংলাদেশে রয়েছে ১৮ কোটি, ভারতবর্ষে ১১ কোটি এবং অন্যান্য দেশগুলোতে রয়েছে ১ কোটিরও বেশি। বাংলা ভাষাতেই বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। এশিয়াতে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাভাষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সার্বিক বিবেচনায় বাংলা একটি আন্তর্জাতিক সহায়ক ভাষার তুল্য।

বাংলা ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তান শাসনামলে (১৯৪৭–১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ) তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি লাভের জন্য যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, সেই আন্দোলন 'বাংলা ভাষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের কারণে পূর্ব-বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবোধের নবজাগরণ ঘটেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবের বীজমন্ত্রও ছিল ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম অধ্যায়। পরবর্তী সময়ের এই আন্দোলনের সফলতা ভাষার অধিকারসহ সার্বিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত প্রতিটি দেশ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। একুশে ফেব্রুয়ারি তথা ভাষাশহিদ দিবসকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেকেই ভাবছিলেন। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে এই লক্ষ্যে ময়মনসিংহ জেলার 'গফরগাঁও থিয়েটার' নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রথম প্রকাশ্যে এই দাবি তুলে। এই দাবির স্বপক্ষে সংগঠনটি ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে একটি সংকলন প্রকাশ করে। সংকলনের স্লোগান ছিল 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস চাই/একুশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চাই!'

আন্তর্জাতিকভাবে এই বিষয়টি জাতিসংঘের নজরে আনার চেষ্টা করে 'মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অফ দা ওয়ার্ল্ড' নামের একটি কানাডিয়ান সংগঠন। এই সংগঠনে দুজন বাংলাদেশি সদস্যও ছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে সংগঠনটি জাতিসংঘে একটি প্রস্তাব পাঠিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব করে। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ তারা জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠান। এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিলেন ৭টি ভাষার ১০জন প্রতিনিধি। তারা হলেন–

১. অ্যালবার্ট ভিনজন [ফিলিপিনো]
২. কারমেন ক্রিস্টোবাল [ফিলিপিনো]
৩. জ্যাসন মোরিন [ইংরেজ]
৪. সুসানহজিন্স [ইংরেজ]
৫. ড. কেলভিনচাও [ক্যান্টনিজ]
৬. নাজনীন ইসলাম [কা-চি]
৭. রেনাটেমার্টিনস [জার্মান]
৮. করুণা জোসি [হিন্দি]
৯. রফিকুল ইসলাম (বাংলা)
১০. আব্দুস সালাম [বাংলা]

জাতিসংঘ বিষয়টি ইউনেস্কোর কাছে তুলে ধরার পরামর্শ দেয়। এরপর রফিকুল ইসলাম ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বছরখানেক পর ইউনেস্কো এই দাবি গ্রহণ করে। তবে তারা জানায়, এই জাতীয় দাবি তুলতে হবে জাতিসংঘের কোনো সদস্য দেশকে। এরপর রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অভিহিত করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি প্রস্তাব তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠান। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রস্তাবটি গ্রহণ করে প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে পেরণ করেন।

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে প্রস্তাবটি পাঠানো হয়।

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম সম্মেলনে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার ক্রিয়া পদের পার্থক্য

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
বলিতেছে	বলছে	করিও	করো
করিয়াছেন	করেছেন	মারিয়াছেন	মেরেছেন
শুনাইয়াছেন	শুনিয়েছেন	পরাইয়াছ	পরিয়েছ
করাইয়াছ	করিয়েছ	ধরিয়াছেন	ধরেছেন
ঘুমাইয়াছেন	ঘুমিয়েছেন	খাওয়াইলেন	খাওয়ালেন
করিয়াছি	করেছি	করাইলেন	করালেন
করিলাম	করলাম/করলুম	করিতেছি	করছি
করিতেছিলাম	করছিলাম/করছিলুম	হইতেছিল	হচ্ছিল
করিতেছিল	করছিল	বলিয়াছেন	বলেছেন
গিয়াছিলাম	গিয়েছিলাম/গিয়েছিলুম	খাইয়াছি	খেয়েছি
যাইতেছে	যাচ্ছে	খাইবেন	খাবেন
খাইতেছে	খাচ্ছে	আসিয়াছিল	এসেছিল
হাসিতেছে	হাসছে	আসিয়াছেন	এসেছেন
যাইতেছিল	যাচ্ছিল	আসিতেছেন	আসছেন
যাইবেন	যাবেন	আসিও	এসো
আসিল	আসল, এলো	পারিতাম	পারতাম, পারতুম

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় সর্বনাম পদের পার্থক্য

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
ইহার	এর/এটার/এটির	কাহাদের	কাদের
তাহাতে	তাতে	ইহাকে	একে
উহাদের	ওদের	উহারা	ওরা
উহা	ও/ওটা/ওটি	উহাকে	ওকে
তাহা	তা	উহাদিগকে	ওদেরকে
তাহাদিগকে	তাদেরকে	কাহার	কার
আমাদিগকে	আমাদেরকে	ইহা	এ/এটা/এটি
ইহাদের	এদের	তাহারা	তারা
যাহারা	যারা	তাহার/তাঁহার	তার/তাঁর
ইহারা	এরা	তাহাদের/তাঁহাদের	তাদের/তাঁদের
কাহাকে	কাকে	যাহাদের/যাঁহাদের	যাদের/যাঁদের
যাহা	যা		

সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় অব্যয় পদের রূপের পার্থক্য

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
তাহা হইলে	তাহলে	তথাপি	তবুও
হইলে	হলে	প্রায়শ	প্রায়ই
না হইলে	নইলে	নতুবা	নইলে
নচেৎ	নইলে	অদ্যাবধি	আজও/আজঅবধি
যদ্যপি	যদিও	অদ্যাপি	আজও/আজঅবধি
বরঞ্চ	বরং	কদাচ	কখনো

প্রচলিত শব্দের রূপগত পার্থক্য

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
ভ্রাতা	ভাই	বাহির	বার
শালিকা	শালি	শুষ্ক	শুকনো
ভগ্নী	বোন	ভিতর	ভেতর
হস্তী	হাতি	নাই	নেই
গাত্র	গা	মাতা	মা
ছত্র	ছাতা	একাদশ	এগারো
পদ	পা	দ্বাদশ	বারো
পশ্চাতে	পেছনে	অষ্ট	আট
বৎসর	বছর	উষ্ট্র	উট
ক্রোড়	কোল	চন্দ্র	চাঁদ
যুগল	জোড়	তাম্র	তামা
দধি	দই/দৈ	পক্ষী	পাখি
গর্দভ	গাধা	বন্য	বুনো
পার্শ্বে	পাশে	বধূ	বউ/বৌ
তদপেক্ষা	তার চেয়ে	ষোড়শ	ষোলো
অগ্নি	আগুন	সর্ব	সব
চর্মকার	চামার	সর্প	সাপ
ষণ্ড	ষাঁড়	হস্ত	হাত

সাধু ভাষার আরও উদাহরণের জন্য নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করো।

সাধু ভাষার উদাহরণ

৪. আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জারপন্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক। সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

[বিড়াল– বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

৫. হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বৈকি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না! যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না। হঠাৎ বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না। *[অপরিচিতা– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]*

৬. এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িয়া নাই।

[অপরিচিতা– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৭. আমি কিন্তু বিবাহ সভাতেই বুঝিয়া ছিলাম, দানের মন্ত্রে স্ত্রীকে যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে সংসার চলে, কিন্তু পনেরো আনা বাকি থাকিয়া যায়। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহ মাত্র করে, পায় না এবং জানেও না সে পায় নাই; তাহাদের স্ত্রীর কাছেও আমৃত্যু কাল এ খবর ধরা পড়ে না। সে যে আমার সাধনার ধন ছিল; সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ।

৮. সেই রাত্রেই চৌকিদার থানায় গিয়া সংবাদ দিল যে, প্রসাদপুর কুঠিতে খুন হইয়াছে। সৌভাগ্যবশত থানা সে স্থান হইতে ছয় ক্রোশের ব্যবধান। দারোগা আসিতে পরদিন বেলা দ্বিপ্রহর হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত সুরতহাল ও লাশ-তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃতদেহ বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া গোরুর গাড়িতে উঠাইয়া চৌকিদারের সঙ্গে ডাক্তার খানায় পাঠাইলেন। পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিলেন।

৯. বিশ্বের বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে গ্রন্থাগারও একটি। মহাসমুদ্রের শতবৎসরের কল্লোল যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত তবে সে নীরব মহাসমুদ্রের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর অগ্নিফল অক্ষরের শৃঙ্খলে কালচামড়ার কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।

১০. মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য আপন জীবিকা নির্বাহ ও প্রাধান্য প্রাপ্তি বিষয়ে অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় উদ্যোগ ও উৎসাহকে একমাত্র উপায় স্বরূপ অবলম্বন করা। অশন, বসন অথবা অন্যবিধ অভিলক্ষণীয় বস্তু লাভ বিষয়ে অন্যের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা কদাচ উচিত নহে।

১১. আজর স্ত্রী পুত্রগণের নিকট যাইয়া বিষণ্নভাবে বলিলেন, "হোসেনের মস্তক রাখিতে সংকল্প করিয়া ছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহেনা। আমি তোমাদের সহায়ে সৈনিক পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশা এই স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু আমি স্বয়ং যাঞ্চা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি, আবার সেও বিশ্বাস করিয়া আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। এ অবস্থায় তাহার প্রাণবধ করিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার সহিত নরহত্যা পাপ পঙ্কিলে ডুবিতে হয়।"

১২. শীতের সূর্য অপরাহ্ণ বেলায় ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল এবং তাহারই উত্তপ্ত কিরণে শ্যেন নদের পার্শ্ববর্তী সুদূরবিস্তীর্ণ বালু-মরু ধু-ধু করিতেছিল। এমনি সময়ে একটা বাঙলো বাটির বারান্দায় রেলিং ধরিয়া অচলা সেইদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নিজের জীবনের সঙ্গে ওই দগ্ধ-মরুখণ্ডের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল কিনা, সে অন্য কথা, কিন্তু ঐ দুটি অপলক চক্ষুর প্রতিপলক মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইতে পারিত যে, তেমনি করিয়া চাহিয়া থাকিলে দেখা কিছুই যায় না, কেবল সমস্ত সংসার একটা বিচিত্র ও বিরাট ছায়া বাজীর মত প্রতীয়মান হয়।

১৩. চোখের জলে স্নেহ-সুধাসিক্ত ঐ কয় পঙ্‌ক্তি লেখা বারে বারে পড়িলাম, টাকা দশটি লইয়া মাথায় ঠেকাইলাম। তখনো আমি তাহাকে দেখিনাই। কাঙাল ভক্তের মত দূর হইতেই তাঁহার লেখা পড়িয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি, শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি। সেই দিন প্রথম মানসনেত্রে কবির স্নেহ-উজ্জ্বল মূর্তি মনে রচনা করিলাম, গলায়, পায়ে ফুলের মালা পরাইলাম।

১৪. এই মহিলা তাহার ধাত্রী-মাতা হালিমা। মাতৃহারা হইয়া শৈশবে তিনিই হারবুকের পীযূষ ধারা পান করিয়া মানুষ হইয়াছিলেন। ইহারই ক্রোড় শৈশবে তাঁহার ক্রীড়াস্থল ও ইহারই বক্ষ অভিমানের আশ্রয়স্থল ছিল। মহাপুরুষ বহুদিন পরে সেই পালয়িত্রী ধাত্রী-মাতাকে দেখিয়া স্নেহবশে আলিঙ্গন করিলেন, আপনার অঙ্গাবরণ বসিবার জন্য পাতিয়া দিলেন, প্রেমাবেগে বলিলেন, 'মা, আমার মা।'

১৫. সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্য প্রথামত বাইরে বৈঠকখানার ঢালাবিছানার উপরে রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি।

(২) চলিত ভাষা: সাধু ভাষার পাশাপাশি অপর একটি ভাষা রীতি কথ্য বা চলিত রীতি বা চলিত ভাষা নামে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মৌখিক বা কথ্য ভাষাকে মার্জিত রূপে লিখিত ভাষায় অর্থাৎ সাহিত্যে ব্যবহার করার লক্ষ্যে চলিত ভাষার প্রচলন হয়। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা অঞ্চল এবং ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী কৃষ্ণনগর অঞ্চলের ভদ্র ও শিক্ষিত অধিবাসীদের মৌখিক ভাষা সাধারণভাবে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজের কাছে শ্রেষ্ঠ বা আদর্শ মৌখিক ভাষা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই মৌখিক ভাষা বা কথ্য ভাষা চলিত রীতি নামে সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। আধুনিক যুগে বা বর্তমান কালে সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হচ্ছে। চলিত রীতি কৃত্রিমতা বর্জিত। চলিত রীতিতে সর্বনাম, ক্রিয়া পদ, অনুসর্গ ও অব্যয় পদ পরিবর্তিত হয়ে সংক্ষিপ্ত ও সহজতর রূপ লাভ করে। যেমন– তারা, তাদের, করেছি, করছি, চলেছি, চলছি, হতে, থেকে, যদিও, তবু ইত্যাদি।

চলিত রীতি সহজ-সাবলীল ও শ্রুতিমধুর হওয়ায় গদ্য সাহিত্য ছাড়াও বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও নাট্য-সংলাপের জন্য বেশি উপযোগী। চলিত ভাষা গতিশীল হওয়ায় সকল প্রকার ভাব ও বিষয়বস্তু প্রকাশে সক্ষম। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে চলিত ভাষার সংজ্ঞার্থ হলো– "যে ভাষা রীতিতে সর্বনাম, ক্রিয়া পদ, অব্যয় ও অনুসর্গ পরিবর্তিত হয়ে সংক্ষিপ্ত সহজ রূপ লাভ করে, গুরুগম্ভীর ও সংস্কৃতানুসারী শব্দ বা তৎসম শব্দসমূহ বর্জন করে এবং মানুষের মৌখিক ভাষা বা কথ্য ভাষাকে মার্জিত রূপে, সহজ ও সরলভাবে প্রকাশ করে তাকে চলিত ভাষা বলে।"

চলিত ভাষার আরও উদাহরণের জন্য নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করো।

চলিত ভাষা

৪. হরিশের কাছে শুনেছি, মেয়েটিকে আমার ফটোগ্রাফ দেখানো হয়েছিল। পছন্দ করেছে বৈকি। না করার তো কোনো কারণ নেই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করে এক-একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলে দেখে না। যখন ঝুঁকে পড়ে দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়ে এলোচুল এসে পড়ে না। হঠাৎ বাইরে কারও পায়ের শব্দ পেলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকিয়ে ফেলে না।

৫. আমি হাত বাড়াতেই সেই আলোর ফুল আমার হাতে উঠে এল, কিন্তু ধরা পড়ল না। বাকি রাতটা আমার নির্ঘুম কাটল। কতবার সেই ফুল ধরতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। সৌন্দর্য হাতে না আসার বেদনায় কাটল আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন।

৬. আমি সকাল ছ'টায় ট্রেন থেকে নেমে দেখি, আমার জন্য স্টেশনে পাল্কি বেহারা হাজির রয়েছে। পাল্কি দেখে তার অন্তরে প্রবেশ করবার যে বিশেষ লোভ হয়েছিল, তা বলতে পারি নে। কেননা চোখের আন্দাজে বুঝলাম যে, সেখানি প্রস্থে দেড় হাত আর দৈর্ঘ্যে তিন হাতের চাইতেও কম। তারপর বেহারাদের চেহারা দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। এমন অস্থিচর্মসার মানুষ, অন্য কোনো দেশে বোধহয় হাসপাতালের বাইরে দেখা যায় না।

৭. পুল পেরিয়ে সামনে একটি বাঁশ বাগান পড়ল। তারিমধ্য দিয়ে রাস্তা। মচ্‌মচ্‌ শুকনো বাঁশ পাতার রাশ ও বাঁশের খোসা জুতোর নিচে ভেঙে যেতে লাগল।

৮. আমি এক-এক সময় ভাবি, লেখার একটি স্কুল খুললে কেমন হয়। বিজ্ঞাপনে দেখেছি, বিলেতে অনেক স্কুল আছে যারা পত্রযোগে গল্প লিখতে শেখায়। তাদের শিক্ষার প্রণালি প্রত্যক্ষ জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু অনুমান করি যে বিলেতি সচিত্র মাসিকে যে এক ধরনের ছক-কাটা মাপসই গল্প ছাপানো হয়, সে গল্প এদের সাহায্যে লিখতে শেখা অসম্ভব নয়।

৯. কবিতা লেখার সময়ে কোনো এক রহস্যময় কারণে, আমি শুনতে পাই চাবুকের তুখোড় শব্দ, কোনো নারীর আর্তনাদ, একটি মোরগের দৃপ্ত ভঙ্গিমা, কিছু পেয়ারা গাছ, বাগান ঘেরা একতলা বাড়ি, একটি মুখচ্ছবি, তুঁতগাছের ডালের কম্পন, ধিকিয়েচলা ঘোড়ারগাড়ি, ঘুমন্ত সহিস ভেসে উঠে দৃষ্টিপথে বারংবার। কিছুতেই এগুলো সরিয়ে দিতে পারে না।

১০. গল্প শুনেছি ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান আর স্কচ এ চারজন মিলে একটা চড়ুই ভাতির ব্যবস্থা করল। বন্দোবস্ত হলো সবাই কিছু সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ইংরেজ নিয়ে এল বেকন আর আন্ডা, ফরাসি নিয়ে এল এক বোতল শ্যাম্পেন, জার্মান নিয়ে এল ডজন খানেক সসেজ, আর স্কচম্যান? সে সঙ্গে নিয়ে এল তার ভাইকে।

১১. পরের ধনে পোদ্দারি করা হচ্ছে যখন বাংলা ভাষার চিরকেলে বদ অভ্যাস, তখন এ যুগে তা অসংখ্য ইংরেজি শব্দ মুখস্থ নয় উদরস্থও করবে সে তো ধরা কথা। এতে বাংলা তোতার স্বধর্মই পালন করে চলেছে। তবে আমাদের ভাষায় পরকে আপন করার স্বভাবের বিরুদ্ধে আজ কেন আপত্তি উঠেছে? এর একটি কারণ, পূর্বে বাংলা ভাষা বিদেশি শব্দ বেমালুম আত্মসাৎ করেছে; অপরপক্ষে আজ তার এ চুরি বিদ্যেটা এক ক্ষেত্রে সহজেই ধরা পড়ে। সেকালে বাংলা মুসলমানদের কাছ থেকে ধর্মের ভাষা নিয়েছিল, পর্তুগিজ-ফরাসিদের কাছ থেকে নিয়েছিল শুধু জিনিসের নাম, আর আজ আমরা ইংরেজি থেকেও দুজাতীয় কথা তো নিচ্ছিই তার উপরন্তু তা জ্ঞানের ভাষাও আত্মসাৎ করেছি।

১২. যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তখন এখানকার এ কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেন তার গলায় সোনার হার, পায়ে দু'গাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

১৩. ও কি শব্দ। ঐ! আবার! আবার! ও কি শব্দ জাহানারা? ওই আবার! শুনেছিস? দারা কি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বিজয় গর্বে আগ্রায় ফিরে এল? কি জাহানারা, চোখ ঢাকছিস যে? বুঝেছি মা এ দারার বিজয় ঘোষণা নয় এ নতুন এক দুঃসংবাদ। তাই কি?

সাধু ও চলিত ভাষা রীতি এবং রূপান্তরের নিয়ম

১. **ক্রিয়া পদে রূপগত পার্থক্য:** সাধারণত সাধু ভাষার সঙ্গো চলিত ভাষার ব্যবধান সৃষ্টি হয় ক্রিয়া পদের ক্ষেত্রে। সাধু ভাষায় ক্রিয়া পদের সনাতন রূপটি বজায় থাকে; অপর পক্ষে চলিত ভাষায় উচ্চারণের সুবিধার্থে সংক্ষিপ্ত রূপটি গৃহীত হয়।

(ক) **অসমাপিকা ক্রিয়া:** সাধু ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়া-বিভক্তি -ইয়া, -ইতে, -ইলে চলিত ভাষায় যথাক্রমে এ, তে, লে হয়। যেমন– ইয়া, এ; ইতে, তে; ইলে, লে।

(সাধু)	(চলিত)	(সাধু)	(চলিত)	(সাধু)	(চলিত)
বসিয়া	বসে	বসিতে	বসতে	বসিলে	বসলে
লিখিয়া	লিখে	লিখিতে	লিখতে	লিখিলে	লিখলে

লক্ষণীয় যে, -ইতে, -ইলে-এর 'ই' লোপ পেয়ে যথাক্রমে 'তে', ও 'লে'-তে পরিণত হয়েছে। আবার অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ফলে -ইয়া হয়েছে।

(খ) সমাপিকা ক্রিয়া:

(i) সাধারণত বর্তমান কালের সাধু ও চলিত ক্রিয়ারূপে ভিন্নতা নেই। যেমন– বলে, চলি, বসি, খায়, পড়ে ইত্যাদি।

(ii) ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীত কালের সাধু ক্রিয়া-বিভক্তি ইতেছ, ইতেছে, ইতেছিল, ইতেছিলে, ইতেছিলাম হতে 'ইতে' লোপ পেয়ে যথাক্রমে হয়েছে– ছ/চ্ছ, ছে/চ্ছে, ছি/চ্ছি; ছিল, ছিলে, ছিলাম। যেমন–

ঘটমান বর্তমান		ঘটমান অতীত	
সাধু	**চলিত**	**সাধু**	**চলিত**
নাচতেছে	নাচ্ছে	ঘুমাইতেছিল	ঘুমাচ্ছিল
করিতেছে	করছে	বসিতেছিল	বসছিল
হাঁটিতেছে	হাঁটছে	পড়িতেছিল	পড়ছিল

(iii) পুরাঘটিত বর্তমান ও পুরাঘটিত অতীত কালের সাধু ক্রিয়া-বিভক্তি -ইয়াছ, -ইয়াছে, -ইয়াছি; -ইয়াছিল, -ইয়াছিলে, -ইয়াছিলাম চলিতরূপে ইয়া এ-তে পরিণত হয়ে যথাক্রমে -এছ, -এছে, -এছি; -এছিল, -এছিলে, -এছিলাম রূপ নেয়। যেমন–

পুরাঘটিত বর্তমান		পুরাঘটিত অতীত	
সাধু	**চলিত**	**সাধু**	**চলিত**
শুইয়াছে	শুয়েছে	জানিয়াছিল	জেনেছিল
শুনিয়াছে	শুনেছে	গাঁথিয়াছিলে	গেঁথেছিলে
করিয়াছি	করেছি	কিনিয়াছিলাম	কিনেছিলাম

(iv) সাধারণ অতীত ও সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে রইলে, ইল, ইলাম; ইবে, ইব সাধু ক্রিয়া-বিভক্তির 'ই' লোপ পেয়ে চলিতরূপে যথাক্রমে লে, ল, লাম; বে, ব হয়।

সাধারণ অতীত		সাধারণ ভবিষ্যৎ	
সাধু	**চলিত**	**সাধু**	**চলিত**
আসিলে	এলে	জানিবে	জানবে
দৌড়াইল	দৌড়াল	খেলিব	খেলব
শুনাইলাম	শুনালাম	হাঁটিব	হাঁটব

(v) আবার নিত্যবৃত্ত অতীত কালের -ইতে, -ইত, -ইতাম সাধু ক্রিয়া-বিভক্তির 'ই' লোপ পেয়ে চলিতে যথাক্রমে হয়েছে তে, ত, তাম। বর্তমান অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে সাধু ও চলিতের রূপ অনেক সময় এক হয়; তবে পার্থক্যও রয়েছে। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় সাধু ও চলিতের পার্থক্য দেখা যায়।

নিত্যবৃত্ত অতীত		বর্তমান অনুজ্ঞা		ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	
সাধু	**চলিত**	**সাধু**	**চলিত**	**সাধু**	**চলিত**

নিত্যবৃত্ত অতীত		বর্তমান অনুজ্ঞা		ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	
লিখিতে	লিখতে	করুক	করুক	যাইয়ো	যেয়ো
পড়িতাম	পড়তাম	লিখ	লেখ	শুইবে	শোবে
হাসিত	হাসত	হউক	হোক	লইস	নিস

(vi) যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অসমাপিকা ও সমাপিকা উভয় ক্রিয়ারূপের পরিবর্তন চলিত রীতিতে দেখা যায়। যেমন–

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
গড়িয়া তোল	গড়ে তোল	ভাঙিয়া দাও	ভেঙে দাও	বলিয়া দাও	বলে দাও
কাঁদিয়া ফেলিবে	কেঁদে ফেলবে	সরিয়া আইস	সরে এসো	ফেলিয়া দাও	ফেলে দাও

২. **সর্বনাম পদের রূপগত পার্থক্য:** সাধু ভাষার পূর্ণাঙ্গ সর্বনাম পদ চলিত ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে ব্যবহৃত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'ই' ধ্বনি লোপ পায়। যেমন–

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
ইহা	এ	যাহার	যার
ইহার	এর	যাঁহাদের	যাঁদের
ইহাকে	একে	যাঁহাদিগকে	যাঁদের
ইহাদিগের	এদের	উহা	ও
যাহা	যা	উহার	ওর
যাহাকে	যাকে	উহাদের	ওদের
তাহাকে/তাঁহাকে	তাকে/তাঁকে	তাহার/তাঁহার	তার/তাঁর
তাহাদিগকে	তাদের	আমাদিগকে	আমাদের

৩. **অনুসর্গের রূপগত পার্থক্য:** ধ্বনির পরিবর্তন, ধ্বনির লোপ এবং পৃথক শব্দ প্রয়োগে সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় অনুসর্গের অবয়বের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন–

ধ্বনি-পরিবর্তন		ধ্বনি-লোপ		পৃথক শব্দ প্রয়োগে	
সাধু	**চলিত**	**সাধু**	**চলিত**	**সাধু**	**চলিত**
আসিয়া	এসে	চাহিতে	চাইতে	ব্যতীত	ছাড়া
করিয়া	করে	বাহির	বাইর/বের	অপেক্ষা	চেয়ে
হাসিয়া	হেসে	হইতে	হতে	হইতে	থেকে

৪. **অব্যয়-এর রূপগত পার্থক্য:**

(i) সাধারণত অতএব, অতঃপর, অচিরাৎ, যদ্যপি, কদাপি, প্রায়শ, বরঞ্চ, নচেৎ, পরন্তু, যুগপৎ, ইদানীং ইত্যাদি তৎসম থেকে আগত অব্যয় পদ সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তবে বাংলা ভাষায় না, বা, কি-না, আচ্ছা, তবু, আর, আরও, তো, আবার, মতো, মতন, ছি, দুর, দুত্তোর প্রভৃতি নিজস্ব অব্যয় চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(ii) চলিত ভাষায় বিদেশি ভাষা থেকে আসা অব্যয় পদগুলোর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন– শাবাশ, মারফত, নাগাদ ইত্যাদি।

(iii) প্রায়শ, বরঞ্চ ইত্যাদি দু-একটি শব্দ সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হলেও এগুলো চলিত ভাষায়ও দেখা যায়।

(iv) ইদানীং এবং, বরং, তবু, তারপর ইত্যাদি অব্যয় পদ সাধু ও চলিত উভয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

৫. **শব্দের প্রয়োগগত ও রূপগত পার্থক্য:**

(i) সাধু ভাষার তুলনায় চলিত ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার কম। এছাড়া চলিত রীতিতে তদ্ভব শব্দের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। যেমন– কার্য – কাজ, ব্রাহ্মণ – বামুন, কর্মকার – কামার, চন্দ্র – চাঁদ ইত্যাদি।

(ii) হ-কার লোপ চলিত ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন– সিপাহি – সিপাই, ফলাহার – ফলার, মহাশয় – মশায়, সাহেব – সাব ইত্যাদি।

(iii) সমীভবন, স্বরাগম, স্বরসংগতি, অভিশ্রুতি, বিপ্রকর্ষ (স্বরভক্তি) প্রভৃতি ধ্বনি-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলিত ভাষায় অনেক শব্দ প্রবেশ করে। যেমন–

সমীভবনের কারণে	:	গল্প – গপ্প, যতদূর – যদ্দুর ইত্যাদি।
স্বরাগমের কারণে	:	স্পর্ধা – আস্পর্ধা, সত্য – সত্যি, স্টেশন – ইস্টিশন ইত্যাদি।
স্বরসংগতির কারণে	:	সূর্য – সুরুজ, বিদ্যা – বিদ্যে, পূজা – পুজো ইত্যাদি।
অভিশ্রুতির কারণে	:	মাটিয়া – মেটে, কন্যা – কনে, গাছুয়া – গেছো ইত্যাদি।
বিপ্রকর্ষ (স্বরভক্তির) কারণে	:	গ্রাম – গেরাম, ঘ্রাণ – ঘেরাণ, চন্দ্র – চন্দোর ইত্যাদি।

(iv) সাধু ভাষার সন্ধি ও সমাসবদ্ধ দীর্ঘপদ ভেঙে চলিত ভাষায় সহজ-সরল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। যেমন– চৌর্যবৃত্তি – চুরির কাজ, অদ্যাপি – আজও, প্রকারান্তর – অন্য প্রকার, আদ্যোপান্ত – আগাগোড়া, দেশান্তর – অন্য দেশ, উদয়াস্ত – সারাদিন, নয়নাভিরাম – সুদর্শন ইত্যাদি।

(v) ধ্বন্যাত্মক, অনুকারাত্মক ও দ্বিত্ব শব্দের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য চলিত ভাষায় লক্ষ করা যায়। যেমন– শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বয়ে চলছে, ভয়ে আমার বুকটা দুরুদুরু করছে, ঝপ্‌ঝপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে ইত্যাদি।

৬. **পদক্রমের পার্থক্য:** সাধু ভাষায় পদক্রমের নিয়মনীতি ঠিকভাবে মানা হলেও চলিত ভাষায় তা মানা হয় না; বরং চলিত ভাষায় পদবিন্যাসের বিষয়টা অনেকটা স্বাধীন। যেমন– 'সমস্ত বিকেলটা যেন তাহার কাটিতেছে না।' এখানে ক্রিয়া পদটি বাক্যের শেষে এসেছে। কিন্তু চলিত ভাষায় দেখা যায় 'যাই বলুন বাংলায় হিন্দু চিত্রের ওপর তাঁর কথার প্রভাব যে অত্যন্ত বেশি তাতে সন্দেহ নেই।' এখানে বাক্যে প্রথমেই ক্রিয়া পদ এসেছে। অর্থাৎ চলিত ভাষায় পদবিন্যাসের ক্ষেত্রে তেমন কোনো কঠোর নিয়ম নেই।

ভাষারীতির রূপান্তর

চলিত রীতি থেকে সাধু রীতিতে রূপান্তরের নিয়ম

১. ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপকে পূর্ণাঙ্গ করে সাধু রীতিতে রূপান্তর করা যায়। যেমন– পড়েছ – পড়িয়াছ, তাদের – তাহাদের, থেকে – থাকিয়া ইত্যাদি।

২. অধিকাংশ শব্দের ক্ষেত্রেই চলিত রীতির সমার্থক তৎসম শব্দের ব্যবহার করে সাধু রীতিতে রূপান্তর করা হয়।

৩. চলিত রীতির নিজস্ব বাগ্‌ধারার বদলে সমার্থক তৎসম শব্দের ব্যবহার করে সাধু রীতিতে প্রয়োগ করা যায়।

৪. পদ বিন্যাসে সাধু রীতিকে গ্রহণ করতে হয়।

চলিত ভাষা থেকে সাধু ভাষা

১. **চলিত:** কিন্তু লাশগুলোকে কোথায় কবর দেওয়া হচ্ছে তা ত ও দেখেছে। সকালবেলা যদি কাউকে আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেয়? লাশ নিয়ে মিছিল করতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে সকালবেলা যদি ছাত্ররা এখানেও খোঁজ করতে আসে?

সাধু: কিন্তু লাশগুলিকে কোথায় কবর দেওয়া হইতেছে তাহা ত সে দেখিয়াছে। সকালবেলা যদি কোনো লোককে আঙুল দিয়া জায়গাটি দেখাইয়া দেয়? লাশ নিয়া মিছিল করিতে না পারিয়া ক্ষেপিয়া গিয়া সকালবেলা যদি ছাত্ররা এখানেও সন্ধান করিতে আসে?

২. **চলিত:** সময় চলে গেল, অতিথি এলো না। অপেক্ষার গুরুভারে বুকের ভিতরটা টনটন করতে লাগল, বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাবণ্য খানিকটা ভিজে এলো জলের ঝাপটা লাগিয়ে।

সাধু: সময় চলিয়া গেল, অতিথি আসিল না। অপেক্ষার গুরুভারে অন্তরের ভিতরটা টনটন করিতে লাগিল, বারান্দায় বাহিরে গিয়া লাবণ্য খানিকটা ভিজিয়া আসিল জলের ঝাপটা লাগাইয়া।

৩. **চলিত:** আমার সামনে আবার একটা ধানখেত, ধান পেকে গেছে। আর পনেরো দিন বাঁচলে কত লোক বেঁচে যেত নিজের খেতের চাল খেয়ে; কিন্তু তা আর হলো কই। হঠাৎ শুনলাম, ধানখেত থেকে শিশুর কান্না আসছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটি লোক জমিন আঁকড়ে মরে পড়ে আছে।

সাধু: আমার সম্মুখে আবার একটা ধানখেত, ধান পাকিয়া গিয়াছে। আর পনেরো দিন বাঁচিলে কত লোক বাঁচিয়া যাইত নিজের খেতের চাউল খাইয়া; কিন্তু তাহা আর হইল কই। হঠাৎ শুনিলাম, ধানখেত হইতে শিশুর কান্না আসিতেছে। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেলাম। দেখিলাম একটি লোক জমিন আঁকড়াইয়া মরিয়া পড়িয়া আছে।

৪. **চলিত:** মানুষের জীবনে ভাষার স্থান যে কত বড়ো তা আমরা খুব কমই ভেবে থাকি। আমরা যেমন খাই-দাই ওঠা-বসা করি ও হেঁটে বেড়াই, তেমনি সমাজ-জীবন চালু রাখার জন্য কথা বলি নানা বিষয়ে, নানা ভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিকতা বজায় রাখতে হলে তার প্রধান উপায় কথা বলা, মুখ খোলা, আওয়াজ করা। একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ যেমনই হোক না কেন শত্রুতার কি ভালোবাসার, চেনা কি অচেনার, বন্ধুত্বের কিংবা মৌখিক আলাপ-পরিচয়ের, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করতে গেলেই মানুষ মাত্রকেই মুখ খুলতে হয়, কতকগুলো আওয়াজ করতে হয়। সে আওয়াজ বা ধ্বনিগুলোর একমাত্র শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো অর্থবোধক হওয়া চাই।

সাধু: মানবজীবনে ভাষার স্থান যে কতখানি বৃহৎ তাহা আমরা যৎকিঞ্চিৎই ভাবিয়া থাকি। আমরা যেই রূপ খাওয়া-দাওয়া উঠা-বসা করিয়া থাকি ও হাঁটিয়া বেড়াই, সেই রূপ সমাজ-জীবন চালু রাখিবার জন্য কথা বলি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিকতা বজায় রাখিতে হইলে তাহার প্রধান উপায় কথা বলা, মুখ খোলা, আওয়াজ করা। একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ যেমনই হউক না কেন শত্রুতার কি ভালোবাসার, পরিচয়ের কি অপরিচয়ের, বন্ধুত্বের কিংবা মৌখিক আলাপ-পরিচয়ের, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই মানুষ মাত্রকেই মুখ খুলিতে হয়, কতকগুলি আওয়াজ করিতে হয়। সেই আওয়াজ বা ধ্বনিগুলির একমাত্র শর্ত হইতেছে যে, সেইগুলি অর্থবোধক হওয়া চাই।

৫. **চলিত:** আমি যদি কবি হতুম, তাহলে আর যে বিষয়েই হোক, বর্ষার সম্বন্ধে কখনো কবিতা লিখতুম না।

সাধু: আমি যদি কবি হইতাম, তাহা হইলে আর যে বিষয়েই হউক, বর্ষার সম্বন্ধে কখনো কবিতা লিখিতাম না।

৬. **চলিত:** বাড়ি এসে প্রথম প্রথম কিছুই লক্ষ করেনি কদম। ক্রমেই ওর মনে হতে লাগল কি যেন নেই যা ছিল। নেই পেতলের বদনাটা। নেই ওর সখের কেনা একজোড়া চিনা মাটির বাসন। নেই এনামেলের বাটিটি। ঘিয়ে রঙের গামলাটাও নেই।

সাধু: বাড়ি আসিয়া প্রথম প্রথম কিছুই লক্ষ করে নাই কদম। ক্রমেই তাহার মনে হইতে লাগিল কি যেন নাই যাহা ছিল। নাই পিতলের বদনাটা। নাই তাহার সাধের ক্রীত একজোড়া চিনা মাটির বাসন। নাই এনামেলের বাটিটি। ঘৃত রঙের গামলাটাও নাই।

সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষা

১. **সাধু:** যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্ব কর্তৃত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহার যথোচিত চর্চা হইতে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সম্মুখে দেখিলাম জাপান যন্ত্র চালনার যোগে দেখিতে দেখিতে সর্বতোভাবে কী রকম সম্পদশালী হইয়া উঠিল।

চলিত: যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চোখের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্র চালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কী রকম সম্পদশালী হয়ে উঠল।

২. **সাধু:** ভাষার এখন শানিয়া ধারবাহির করা আবশ্যক, ভারবৃদ্ধি করা নহে। যেই কথাটা নিতান্ত না হইলে নহে, সেইটি যেইখান হইতে পার লইয়া আইস, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাহাকে খাপ খাওয়াইতে পার। কিন্তু তাহার অধিক ভিক্ষা ঋণ কিংবা চুরি করিয়া আনিওনা। ভগবান পবন নন্দন বিশল্যকরণী আনিতে গিয়া সম্পূর্ণ গন্ধমাদন যে সমূল উৎপাটন করিয়া আনিয়া ছিলেন, তাহাতে তাহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন নাই।

চলিত: ভাষার এখন শানিয়ে ধারবার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যে কথাটা নিতান্ত না হলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এস, যদি নিজের ভাষার ভেতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষে ধার বা চুরি করে এনো না। ভগবান পবন নন্দন বিশল্য করণী আনতে গিয়ে আস্তগন্ধ মাদন যে সমূল উৎপাটন করে এনেছিলেন, তাতে তার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেননি।

৩. **সাধু:** তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে কতকগুলি অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে এক এক সমাজের মানুষ তাহাদের সামাজিক জীবন চালু রাখে। এক এক সমাজের সকল মানুষের অর্থবোধক ধ্বনির সমষ্টিই ভাষা। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভাষা- তাত্ত্বিকগণ ভাষার উৎপত্তি ও মূল খুঁজিতে কত না চেষ্টাই করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, ভাষা খোদার দান। কেহ বলিয়াছেন, কোনো একটি ভাষা হইতে বিশ্বের সমস্ত ভাষার কিংবা অনেকগুলো ভাষা-গোষ্ঠীর উৎপত্তি।

চলিত: তাহলে বোঝা যাচ্ছে কতকগুলো অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে এক এক সমাজের মানুষ তাদের সামাজিক জীবন চালু রাখে। এক এক সমাজের সকল মানুষের অর্থবোধক ধ্বনির সমষ্টিই ভাষা। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভাষাতাত্ত্বিকরা ভাষার উৎপত্তি ও মূল

খুঁজতে কত না চেষ্টাই করেছেন। কেউ বলেছেন, ভাষা খোদার দান। কেউ বলেছেন, কোনো একটি ভাষা থেকে দুনিয়ার সব ভাষার কিংবা অনেকগুলো ভাষা-গোষ্ঠীর উৎপত্তি।

৪. **সাধু:** চলিত ভাষার চলিবার বিরাম নাই, তাহার চলিবার শক্তি আড়ষ্ট হইবার সময় পায় না। আমাদের দিবা-রাত্রির মুখরিত সকল কথা ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার মাটিতে, তাহার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া তাহার প্রকাশের শক্তিকে করিতেছে উর্বরা।

   চলিত: চলিত ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায়না। আমাদের দিন-রাতের মুখরিত সব কথা ঝরে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা।

৫. **সাধু:** প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটি বড়ই বিচিত্র। বাহিরে তাহার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তাহার আর এক মূর্তি।

   চলিত: প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র। বাইরে তার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর এক মূর্তি।

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ষোড়শ শতক থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

গদ্যের পূর্বকালীন প্রেক্ষাপট

বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে প্রাচীন ও মধ্য যুগ জুড়ে কবিতা ছিল একচ্ছত্র প্রভু। মঙ্গালকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, রামায়ণ–মহাভারতের অনুবাদ– সবই রচিত হয়েছিল পদ্যে। সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গদ্যের কোনো সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না। তৎকালীন ধারণা ছিল, কাব্যভাষাই একমাত্র সাহিত্যিক ভাষা।

এই পরিস্থিতিতে গদ্যের ব্যবহার মূলত তিনটি ক্ষেত্রে সীমাবন্ধ ছিল: রাজকীয় দলিল ও চুক্তিপত্র, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং ধর্মীয় আলোচনা। ১৫৫৫ সালে কোচবিহারের রাজা কর্তৃক আসামের রাজাকে লেখা একটি পত্রকে গবেষকেরা বাংলা গদ্যের সবচেয়ে প্রাচান নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে এটি সাহিত্যিক নয়, প্রশাসনিক দলিল।

আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের শুরুতে উপনিবেশিক প্রশাসন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও মুদ্রণ যন্ত্রের আগমনে পরিস্থিতি আমূল বদলে যায়। রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় সাহিত্যেও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং বাংলা গদ্যের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ সম্ভব হয়।

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাচিত্র

স্তর–১
আদি নিদর্শন পর্ব
ষোড়শ শতক – ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ
কোচবিহার রাজার চিঠি (১৫৫৫) ● পর্তুগিজ মিশনারিদের গদ্যরচনা ● দলিল–দস্তাবেজ
মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও-এর ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ (১৭৪৩) ● হ্যালহেডের ব্যাকরণ (১৭৭৮)

↓

স্তর–২
উন্মেষ পর্ব – ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
১৮০০ – ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ
উইলিয়াম কেরির ‘কথোপকথন’ (১৮০১) ● রামরাম বসুর ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ (১৮০১)
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচনা ● রাজা রামমোহন রায়ের গদ্যচর্চা (১৮১৫ থেকে)

↓

স্তর–৩
অভ্যুদয় পর্ব – বিদ্যাসাগর যুগ
১৮৪৭ – ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর – সাধু গদ্যের প্রতিষ্ঠা ও যতিচিহ্নের প্রবর্তন
আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮) ● হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা (১৮৬২)–চলিত রীতির উন্মেষ

↓

স্তর–৪
পরিণতি পর্ব – বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
১৮৬৫ – ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ
বঙ্কিমচন্দ্র – সাধু গদ্যের চরম উৎকর্ষ ● বঙ্গদর্শন পত্রিকা (১৮৭২)
রবীন্দ্রনাথ – চলিত ভাষার সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ● সাধু গদ্যের বিলুপ্তি

↓

স্তর–৫
আধুনিক পূর্ণতা পর্ব
১৯৪১ – বর্তমান
শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌
আধুনিক বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের গদ্যসাহিত্য – বিশ্বমানের পর্যায়ে উত্তরণ

চিত্র: বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পাঁচটি স্তর (ড. সুকুমার সেনের শ্রেণিবিভাগ অনুসরণে পরিমার্জিত)

সূত্র: ড. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

প্রাথমিক গদ্যের নিদর্শন (১৫৫৫–১৮০০)

বাংলা গদ্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই আমাদের মধ্যযুগের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হয়। ষোড়শ–সপ্তদশ শতকের কোচবিহারের রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পত্রাবলিতে বা বৈষ্ণব সহজিয়াদের কড়চা গ্রন্থে বাংলা গদ্যের একটি আদি ছাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এই গদ্য সাহিত্যিক উদ্দেশ্যে রচিত ছিল না।

পর্তুগিজ মিশনারিদের অবদান

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পর্তুগিজ ক্যাথলিক মিশনারিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার ভূষণার জমিদারপুত্র, যিনি পরে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে **দোম আন্তোনিও দা রোজারিও** নামে পরিচিত হন, তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' রচনা করেন। বইটি প্রশ্নোত্তর আকারে রচিত এবং এটি রোমান হরফে লিসবন থেকে মুদ্রিত। এটিকে বাঙালি-রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও ১৭৩৪ সালে রচনা করেন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। বর্তমান গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার নাগরী নামক স্থানে লিখিত এই গ্রন্থটি ১৭৪৩ সালে লিসবন থেকে রোমান হরফে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃত ভাষার নমুনা: *"সেভিল্যা শুহরে এক গৃহস্থ আছিল, তাহার নাম সিরিলো, সেই সিরিলো কেবল এক পুত্রো জর্মাইল তাহারে এতো দয়া করিলো যে কোনো দিন তাহারে শিক্ষাও না দিলো..."* এই ভাষায় সাধু রীতির কাঠামোর মধ্যে চলিত রীতির স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

একই বছর (১৭৪৩) তিনি একটি পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ তৈরির কাজও শুরু করেন, যদিও তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এছাড়া ১৭৭৮ সালে ন্যাথানিয়াল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত বাংলা ব্যাকরণও সাধু রীতির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

> **লক্ষণীয়:** এই প্রাথমিক পর্বের গদ্য কখনো খাঁটি সাধু রীতিতে, কখনো চলিত রীতির ইঙ্গিত রেখে লেখা হয়েছে। ভাষাবিদ **ড. সুকুমার সেন** এই পর্বকে 'সূচনা পর্ব' (ষোড়শ শতক–১৮০০) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও গদ্যের ভিত্তিনির্মাণ (১৮০০–১৮৪৭)

বাংলা গদ্যের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের ইতিহাসে ১৮০০ সালটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওই বছরের ৪ মে লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতার লালবাজারে 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ভারতীয় ভাষা, আইন ও সংস্কৃতি শেখানো।

একই বছর ডেনিশ মিশনারিদের উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখান থেকে বাংলায় মুদ্রিত হয় 'মিশন সমাচার'। তবে এই উদ্যোগকে বাঙালির লেখা বলা যায় না।

উইলিয়াম কেরি ও তাঁর সহযোগীরা

১৮০১ সালের ২৪ নভেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয়। বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন পাদ্রি উইলিয়াম কেরি। তিনি ১৭৯৩ সালে বঙ্গদেশে এসেছিলেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধিতার মুখে শ্রীরামপুর মিশনে আশ্রয় নিয়ে ১৮০০ সালে ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ও যশুয়া মার্সম্যান।

কেরির 'কথোপকথন' (১৮০১) বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ হিসেবে বহুল স্বীকৃত। এই গ্রন্থে তিনি সরাসরি কথ্য ভাষার প্রয়োগ করেন: "ওলো তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাসে তাহা বল শুনি।" এই কারণে এটিকে বাংলা কথ্যভাষার প্রথম নিদর্শনও বলা হয়। তবে পাণ্ডিত্যের দিক থেকে এই ভাষা 'খ্রিস্টানী বাংলা' নামে পরিচিত হয়েছিল, কারণ এতে বিদেশি শব্দের প্রাচুর্য ছিল।

উইলিয়াম কেরি
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগীয় প্রধান
'কথোপকথন' (১৮০১) রচনা করেন। কথ্য ভাষার প্রথম মুদ্রিত নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত।

রামরাম বসু
কেরি সাহেবের মুন্সী
'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) – বাঙালির লেখা বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ। 'লিপিমালা' – বাংলা পত্রসাহিত্যের আদি নিদর্শন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
পণ্ডিত, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
সংস্কৃতপ্রধান 'পণ্ডিতী বাংলা'–র প্রতিষ্ঠাতা। ১৮০৫ সালে কেরির ব্যাকরণে সংস্কৃত রীতির প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা রামমোহন রায়
সমাজসংস্কারক ও গদ্যলেখক
যুক্তিনিষ্ঠ, সরল বাক্যকাঠামোর গদ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫) থেকে শুরু।

দুটি ধারার উন্মেষ

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যচর্চা থেকেই দুটি আলাদা ধারার জন্ম হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ও চণ্ডীচরণ মুন্সী তৎসম-শব্দবহুল জটিল 'পণ্ডিতী বাংলা' চর্চা করতেন। অপরদিকে কেরির লেখায় কথ্যভাষার ছাঁদ স্পষ্ট ছিল। এই দুই ধারা পরবর্তীকালে যথাক্রমে 'বিদ্যাসাগরী রীতি' ও 'আলালী রীতি' নামে পরিচিত হয়।

বিদ্যাসাগর ও গদ্যের শিল্পিত রূপ (১৮৪৭–১৮৬৫)

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০–১৮৯১) আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয়। ড. সুকুমার সেন তাঁর আবির্ভাবের বছর (১৮৪৭) থেকে বাংলা গদ্যের তৃতীয় স্তর বা 'অভ্যুদয় পর্ব' গণনা করেছেন।[৯]

বিদ্যাসাগর গদ্যকে কেবল তথ্য পরিবেশনের হাতিয়ার হিসেবে দেখেননি; তিনি একে শিল্পের মাধ্যম করে তুলেছিলেন। তাঁর গদ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল: প্রাঞ্জলতা, শ্রুতিমাধুর্য, প্রসাদগুণ এবং লালিত্য ও গাম্ভীর্যের সমন্বয়। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হলো বাংলা গদ্যে প্রথমবারের মতো যতিচিহ্ন– দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করা, যা গদ্যকে ছন্দময় করে তুলেছিল।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'শকুন্তলা' (১৮৫৪), 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) – এই রচনাগুলোতে তিনি ভাষার আশ্চর্য নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর এই গদ্যরীতি পরবর্তীকালের প্রাবন্ধিকদের আদর্শ হয়ে ওঠে।

আলালী ও হুতোমি (১৪০২) ভাষা: চলিত রীতির আন্দোলন

বিদ্যাসাগরের সাধু গদ্যের পাশাপাশি একটি বিপরীত ধারাও গড়ে উঠছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে ১৮৫৮ সালে প্রকাশ করেন 'আলালের ঘরের দুলাল'। এই বইতে সাধু ভাষার বদলে কলকাতার মুখের ভাষা ব্যবহার করা হয়। ভবানীচরণের পথ ধরে প্যারীচাঁদ কথাসাহিত্যে চলিত ভাষার প্রয়োগসিদ্ধি দেখালেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬২)–তে আঞ্চলিক ও ব্যঙ্গাত্মক ভাষার সফল ব্যবহার করেন। তবে উল্লেখ্য, প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন উভয়েই তাঁদের অন্যান্য রচনায় সাধু রীতিই অনুসরণ করতেন। প্রথম পর্বে চলিত রীতি মযাদাসম্পন্ন হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

বিষয়	সাধু রীতি (বিদ্যাসাগরী)	চলিত রীতি (আলালী/হুতোমী)
শব্দভান্ডার	তৎসম ও সংস্কৃত শব্দবহুল	আরবি-ফারসি মিশ্রিত কথ্য শব্দ
ক্রিয়ারূপ	করিয়াছেন, বলিলেন, যাইব	করেছেন, বললেন, যাব
রচনার ধরন	প্রবন্ধ, দার্শনিক ও ধর্মীয় গদ্য	নকশা, ব্যঙ্গারচনা, কথাসাহিত্য
সামাজিক মর্যাদা	উচ্চবর্গীয়, পন্ডিত-স্বীকৃত	প্রথম পর্বে অমর্যাদাকর বিবেচিত
প্রধান রচয়িতা	বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়	প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ

বঙ্কিমচন্দ্র ও সাধু গদ্যের চরম উৎকর্ষ (১৮৬৫–১৮৯৪)

ড. সুকুমার সেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকাল (১৮৬৫) থেকে বাংলা গদ্যের চতুর্থ বা 'পরিণতি পর্ব' গণনা করেছেন। বিদ্যাসাগরী রীতি অবলম্বন করেও বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষায় ধ্বনিমাধুর্য সঞ্চার করে গদ্যকে এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে যান।

১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করে তিনি বাংলা গদ্যের একটি সার্থক রূপ প্রতিষ্ঠা করলেন। উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা ও রম্যরচনা– সব মাধ্যমে তিনি বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তুললেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের একটি বিশেষ দিক হলো তিনি 'আলালী' ও 'বিদ্যাসাগরী' – দুই রীতির একটি সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁকে সমালোচকেরা 'শবপোড়া, মরাদাহ' বলে ব্যঙ্গও করেছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' – এই উপন্যাসগুলোর ভাষাভঙ্গি বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ ও চলিত রীতির প্রতিষ্ঠা (১৮৮০–১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গদ্যকে হাজারো বৈচিত্র্য ও আবেগের বাহন করে তুললেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো চলিত রীতিকে সাহিত্যের সবোচ্চ মযাদায় পতিষ্ঠিত করা। সাধু ও চলিত রীতির বিচ্ছিন ধারা দুটি তাঁর হাতে একটি সবতোমুখী সমন্বয়ী রূপ ধারণ করে।

রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগরী, আলালী, হুতোমী – এই পর্যায়গুলোতে গদ্যরীতির যে স্বাভাবিক বিচিত্রমুখী বিকাশ ঘটেছিল, রবীন্দ্রনাথের রচনায় তার পূর্ণ পরিণতি ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের এই সমন্বয়প্রচেষ্টাই ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পর থেকে সাধু গদ্যের ব্যবহার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসে এবং বিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাধু গদ্যের বিলুপ্তি কার্যত সম্পন্ন হয়।

কালানুক্রমিক তথ্যসারণি

সাল	পর্ব	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	ঘটনা ও অবদান
১৫৫৫	আদি পর্ব	কোচবিহারের রাজা	আসামের রাজাকে লেখা পত্র – বাংলা গদ্যের প্রাথমিক নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত।
১৭৩৪–৪৩	আদি পর্ব	মানোএল দা আস্সুম্পসাঁও	'কপার শাস্ত্রের অথভেদ' – বাংলা গদ্যের পাথমিক পচেষ্টার পমাণ।
১৭৭৮	আদি পর্ব	ন্যাথানিয়াল ব্রাসি হ্যালহেড	বাংলা ব্যাকরণ রচনা – সাধু রীতির ব্যাকরণিক ভিত্তি নির্মাণ।
১৮০০	উন্মেষ পর্ব	লর্ড ওয়েলেসলি / ফোর্ট উইলিয়াম	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা (৪ মে) ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপন।
১৮০১	উন্মেষ পর্ব	উইলিয়াম কেরি	'কথোপকথন' – বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ ও কথ্যরীতির প্রথম নিদর্শন।
১৮০১	উন্মেষ পর্ব	রামরাম বসু	'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' – বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ।
১৮১৫	উন্মেষ পর্ব	রাজা রামমোহন রায়	'বেদান্তগ্রন্থ' – যুক্তিনিষ্ঠ, সরল বাক্যকাঠামোর সাধু গদ্যের প্রবর্তন।
১৮৪৭	অভ্যুদয় পর্ব	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	'বেতাল পঞ্চবিংশতি' – যতিচিহ্ন ও সাধু গদ্যের শিল্পিত রূপ প্রতিষ্ঠার সূচনা।
১৮৫৮	অভ্যুদয় পর্ব	প্যারীচাঁদ মিত্র	'আলালের ঘরের দুলাল' – কথাসাহিত্যে চলিত রীতির প্রথম সার্থক প্রয়োগ।
১৮৬২	অভ্যুদয় পর্ব	কালীপ্রসন্ন সিংহ	'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' – বর্ণনামূলক রচনায় চলিত রীতি ও ব্যঙ্গভাষার দৃষ্টান্ত।
১৮৭২	পরিণতি পর্ব	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ – সাধু গদ্যের চরম উৎকর্ষ ও দুই রীতির সমন্বয়।
১৯১৪ থেকে	পরিণতি পর্ব	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চলিত রীতিতে লেখা শুরু – 'সবুজপত্র' পত্রিকায় গদ্যভাষার বিপ্লব।

আধুনিক পর্ব এবং উত্তরাধিকার

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রজন্মের সাহিত্যিকগণ বাংলা গদ্যকে আরও বৈচিত্র্যময় করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬–১৯৩৮) আবেগঋদ্ধ সহজ গদ্যে সামাজিক বাস্তবতা উপস্থাপন করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬) মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসেবে গদ্যকে নিয়ে যান সম্পূর্ণ নতুন গভীরতায়।

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন (১৯৫২) এবং মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)–পরবর্তী সাহিত্যে বাংলা গদ্য নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রা লাভ করে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হুমায়ূন আহমেদ প্রমুখ লেখকরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গদ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আজকের বাংলা গদ্য – পত্রিকা, ডিজিটাল মাধ্যম থেকে শুরু করে উপন্যাস পর্যন্ত – মূলত চলিত রীতিতে লেখা হয়। সাধু রীতি এখন কেবল ধর্মীয় গ্রন্থ বা ঐতিহাসিক গবেষণায় দেখা যায়। এই পরিবর্তন বাংলা গদ্যের প্রায় পাঁচ শতকের বিবর্তনের স্বাভাবিক পরিণতি।

বাংলা গদ্যের উদ্ভব: তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

- *সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (চার খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। [বাংলা গদ্যের চারটি স্তর-বিভাজনের প্রামাণিক উৎস]*

- *অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা। [ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, রামরাম বসু ও কেরি সংক্রান্ত বিশদ তথ্যের উৎস]*
- *বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত। বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। Vishwabharati সংগ্রহ, NBU আর্কাইভ রেফারেন্স: ir.nbu.ac.in [সাধু ও চলিত রীতির দ্বৈত ধারা সংক্রান্ত বিশ্লেষণ]*
- *প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস। [আলালী রীতি ও হুতোমী ভাষার আলোচনা]*
- *eBOOK BOU, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। পাঠ্যপুস্তক: HSC বাংলা। ebookbou.edu.bd [রাজা রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের গদ্যচর্চা সংক্রান্ত]*
- *CRP Mahavidzalaya সংকলন। Vidzasagar and Bengali Prose| crpmahavidzalaya.in [বিদ্যাসাগরের রচনারীতি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত]*
- *Bangla Gadzasahityer Itihas (ডিজিটাল আর্কাইভ)। Internet Archive সংগ্রহ: ia801507.us.archive.org [বাংলা গদ্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার প্রামাণিক মূল উৎস]*

এই প্রবন্ধটি একাডেমিক গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত সমস্ত তথ্য প্রামাণিক সূত্র থেকে সংগৃহীত।

পদ্য কাব্যভাষা ও গদ্য কাব্যভাষা

বাংলা কাব্য রীতি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত – পদ্য কাব্য রীতি ও গদ্য কাব্য রীতি। পদ্যে ছন্দ ও মিল থাকে। বাক্য সাজানো হয় ছন্দের নিয়ম মেনে। গদ্য কাব্যে নির্দিষ্ট ছন্দের বাধ্যবাধকতা থাকে না, তবে কবিতার মতো গভীর ভাব ও সুর থাকে।

বৈশিষ্ট্য	পদ্য কাব্যভাষা	গদ্য কাব্যভাষা
ছন্দ	নির্দিষ্ট ছন্দ ও মাত্রা মেনে চলে	নির্দিষ্ট ছন্দের বাধ্যবাধকতা নেই
মিল	অন্ত্যমিল বা অনুপ্রাস থাকে	মিল প্রায়শই থাকে না
পঙ্‌ক্তি গঠন	সম-দৈর্ঘ্যের পঙ্‌ক্তি	অসম দৈর্ঘ্যের পঙ্‌ক্তি
ভাষার ধরন	অলংকৃত, ভাবঘন	সরল, কিন্তু ছন্দময় গদ্যভাব
উদাহরণ	রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’, নজরুলের ‘বিদ্রোহী’	রবীন্দ্রনাথের ‘লিপিকা’, ‘পুনশ্চ’

৩. বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান রীতি

বাংলা পদ্যকাব্যে ছন্দের তিনটি প্রধান রীতি প্রচলিত – অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর ’বাংলা ছন্দ’ গ্রন্থে এই শ্রেণিবিভাগ স্পষ্ট করেছেন। এই তিন রীতির ভিন্ন ভিন্ন গঠন ও লয় আছে।

বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান রীতি

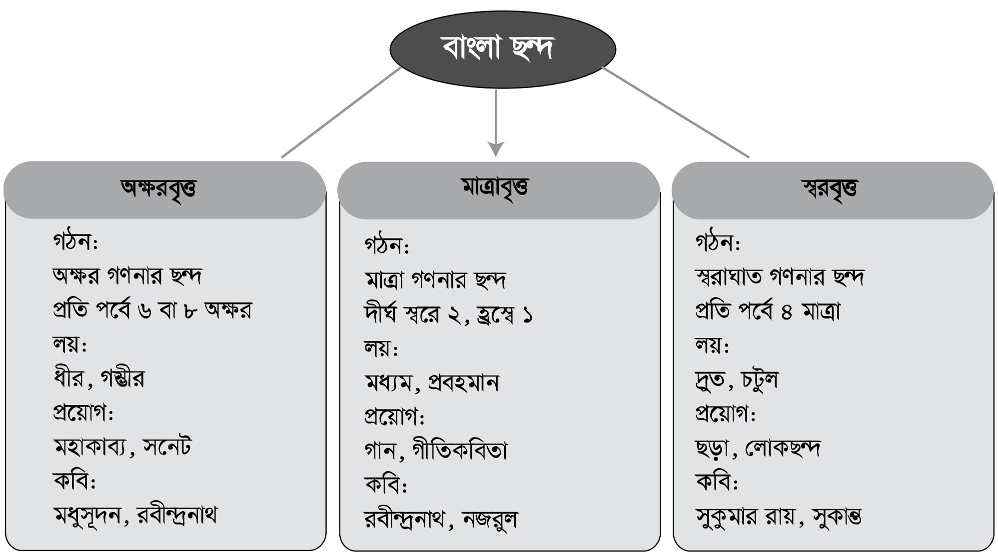

তিন রীতির আলাদা গঠন, লয় ও প্রয়োগক্ষেত্র

সূত্র: প্রবোধচন্দ্র সেন, ‘বাংলা ছন্দ’ (১৯২২)

অক্ষরবৃত্ত: গণনার ছন্দ

অক্ষরবৃত্ত বাংলা ছন্দের সবচেয়ে প্রাচীন ও মর্যাদাসম্পন্ন রীতি। এতে অক্ষর বা ধ্বনি গুনে পর্ব তৈরি হয়। সাধারণত প্রতি চরণে ১৪ অক্ষর থাকে – ৮ + ৬ ভাগে বিভক্ত। মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এই ছন্দে রচিত।

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি

[সম্–মুখ–স–ম–রে–প–ড়ি] = ৮ অক্ষর । [বী–র–চূ–ড়া–ম–ণি] = ৬ অক্ষর

– মধুসূদন দত্ত, 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)

মাত্রাবৃত্ত: সময়ের ছন্দ

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অক্ষর গণনা নয়, ধ্বনি উচ্চারণের সময় গণনা করা হয়। দীর্ঘ স্বরের মাত্রা ২, হ্রস্ব স্বরের মাত্রা ১। বন্ধাক্ষরের মাত্রা ২ (অন্য অক্ষরের আগে), শব্দশেষে ১। এই ছন্দে কবিতার লয় হয় প্রবহমান ও সুরেলা।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন

প্রতি পর্বে ৬ মাত্রা – চলমান, ঊর্ধ্বমুখী লয়

– কাজী নজরুল ইসলাম, 'বিদ্রোহী' (১৯২১)

স্বরবৃত্ত: লোকছন্দের দ্রুতি

স্বরবৃত্ত মূলত লোকজ ছড়া ও কবিতার ছন্দ। প্রতি পর্বে ৪ মাত্রা থাকে। লয় দ্রুত। ছোটোদের ছড়া, কীর্তন, পল্লিগীতি – এই ছন্দে রচিত। সুকুমার রায়ের 'আবোল–তাবোল' স্বরবৃত্তের অসাধারণ নিদর্শন।

ভোম্বল দাস ছিল মস্ত নচ্ছার

[ভোম্–বল] [দাস–ছিল] [মস্–ত] [নচ্–ছার] – প্রতি পর্বে ২+২ স্বরাঘাত

– লোকছন্দের সাধারণ গঠন

মিল ও মিলহীনতার সম্পর্ক

মিল কাব্যভাষার একটি অলংকার। দুটি বা ততোধিক পঙ্‌ক্তির শেষে একই বা সমধ্বনির শব্দ থাকলে তাকে অন্ত্যমিল বলা হয়। মিল কবিতায় ধ্বনিগত সৌন্দয আনে এবং স্মরণ সহজ করে।

মিলের ধরন	পরিচয়	উদাহরণ
অন্ত্যমিল	পঙ্‌ক্তির শেষে মিল	'কাল' – 'হাল'
মধ্যমিল	পঙ্‌ক্তির মাঝে মিল	'সাগরে – নাগরে' (এক পঙ্‌ক্তিতে)
অনুপ্রাস	একই ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তি	'কালো কালো কাঠ'
যমক	একই শব্দ ভিন্ন অর্থে	'কর' (হাত) – 'কর' (করো)
স্বরমিল	স্বরধ্বনির পুনরাবৃত্তি	'আকাশ – বাতাস'

মিলহীন কবিতা

সব কবিতায় মিল থাকে না। 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' মিলহীন কবিতার একটি বিশেষ রীতি। মধুসূদন দত্ত ১৮৬০ সালে 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য'-তে প্রথম এই রীতি প্রয়োগ করেন। পরে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-তে তিনি এই ছন্দকে পরিণতি দেন।

অমিত্রাক্ষরে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গঠন আছে, পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিল নেই। ভাব এক পঙ্‌ক্তি থেকে অন্য পঙ্‌ক্তিতে গড়িয়ে চলে। এই কারণে দীঘ আখ্যান বা মহাকাব্যের জন্য এই ছন্দ বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণীয়: বিংশ শতকের আধুনিক কবিতায় মিলহীনতা ক্রমে জনপ্রিয় হয়। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবি মিলকে গৌণ করে দেন। ভাব ও চিত্রকল্পের গুরুত্ব বাড়ে।

মিশ্র কাব্যভাষা: ১৯শ শতক থেকে ১৯৪৫

বাংলা কাব্যভাষার দীর্ঘ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো মিশ্র কাব্যভাষার যুগ। ১৯শ শতকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই ভাষারীতি বাংলা কবিতায় ব্যাপকভাবে চর্চিত ও গৃহীত ছিল। মিশ্র কাব্যভাষার বৈশিষ্ট্য হলো – এতে সাধু ও চলিত রীতির শব্দ ও ক্রিয়ারূপ পাশাপাশি থাকে।

মিশ্র কাব্যভাষার বৈশিষ্ট্য

মিশ্র কাব্যভাষায় সাধু রীতির 'করিল', 'গেল', 'হইল'-এর পাশাপাশি চলিত রীতির 'করল', 'গেছে', 'হয়ে' ব্যবহৃত হয়। সর্বনামেও একই মিশ্রণ – 'তাহার', 'তাঁর', 'তার' সবই একই কবিতায় আসতে পারে। ছন্দ ও মাত্রার প্রয়োজনই এই মিশ্রণের কারণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যভাষা মিশ্র কাব্যভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি প্রথম জীবনে সাধু রীতিতে কবিতা লিখলেও পরবর্তীকালে চলিত রীতির দিকে ঝোঁকেন। 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'বলাকা' (১৯১৬) – এসব কাব্যগ্রন্থে মিশ্র রীতির প্রকাশ দেখা যায়।

"আজি হতে শতবর্ষ পরে

কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে – আজি হতে শতবর্ষ পরে।"
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিত্রা' (১৮৯৬)

ওপরের পঙ্‌ক্তিতে 'হতে', 'পড়িছ', 'বসি' সাধু রীতির। কিন্তু 'তুমি', 'আমার', 'কবিতাখানি' আদশ চলিত রীতির। এটাই মিশ কাব্যভাষার বৈশিষ্ট্য।

কাজী নজরুলের কাব্যভাষা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬) মিশ্র কাব্যভাষাকে নতুন শক্তি ও আবেগ দিয়েছিলেন। তাঁর 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) থেকে শুরু করে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে আরবি, ফারসি, হিন্দি, সংস্কৃত, বাংলা – সব ভাষার শব্দ মিশে যায়। ছন্দে তিনি মাত্রাবৃত্তের অসাধারণ প্রয়োগ দেখান।

"বল বীর – বল উন্নত মম শির!

শির নেহারি আমারি, নত–শির ওই শিখর হিমাদ্রির!"
– কাজী নজরুল ইসলাম, 'বিদ্রোহী' (১৯২১)

এই পঙ্‌ক্তিতে আরবি-ফারসি ('নেহারি'), সংস্কৃত ('হিমাদি'), তদ্ভব ('শির', 'নত') – সব এক জায়গায় এসেছে। এটাই নজরূলের কাব্যভাষার বিশিষ্টতা।

তিরিশের কবি ও আধুনিকতার সূচনা

১৯৩০-এর দশকে একদল তরুণ কবি – জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১–১৯৬০), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮–১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯–১৯৮২), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১–১৯৮৬) – বাংলা কাব্যভাষায় নতুন বাঁক আনেন। এঁদের 'তিরিশের কবি' নামে চেনা হয়। মিশ্র কাব্যভাষাকে তাঁরা আধুনিকতার আঙিনায় নিয়ে আসেন।

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,

সিংহল-সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয়-সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি"
– জীবনানন্দ দাশ, 'বনলতা সেন' (১৯৪২)

জীবনানন্দের এই পঙ্‌ক্তিতে 'হাঁটিতেছি' সাধু রীতির, 'ঘুরেছি' চলিত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত হলেও পঙ্‌ক্তির গঠন আধুনিক – সংলাপের মতো পবহমান।

প্রমিত কাব্যভাষা: ১৯৪৫ থেকে আধুনিক যুগ

১৯৪৫ সালের পর বাংলা কাব্যভাষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। মিশ্র কাব্যভাষার জায়গায় প্রমিত কাব্যভাষা ক্রমে প্রতিষ্ঠা পায়। সাধু রীতির শব্দ ও ক্রিয়ারূপ কাব্যেও বিলুপ্ত হতে থাকে। চলিত রীতির শুদ্ধ ও পরিশীলিত রূপ – প্রমিত রীতি – কাব্যভাষারও আদর্শ হয়ে ওঠে।

১৯৩০–১৯৪৫ **আধুনিকতার পরীক্ষা** তিরিশের কবিদের হাতে কাব্যভাষায় আধুনিকতার সূচনা। মিশ্র রীতি ব্যবহার, কিন্তু ভাষায় নতুন চিত্রকল্প।	১৯৪৫–১৯৭০ **প্রমিত রীতির প্রতিষ্ঠা** সাধু রূপের ক্রমবিলুপ্তি। চলিত–প্রমিত রীতির পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা। শামসুর রাহমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।
১৯৭০–২০০০ **প্রমিত রীতির বৈচিত্র্য** আল মাহমুদ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী – প্রমিত রীতিতে আঞ্চলিক ও দৈনন্দিন ভাষার সংযোগ।	২০০০–বর্তমান **বহুমুখী কাব্যভাষা** প্রমিত রীতির পাশাপাশি আঞ্চলিক, কথ্য, ডিজিটাল ভাষার মিশ্রণ। কাব্যভাষায় নতুন পরীক্ষা।

প্রমিত কাব্যভাষার বৈশিষ্ট্য

প্রমিত কাব্যভাষায় ক্রিয়ারূপ হ্রস্বতর – ‘করছে’, ‘করেছে’, ‘করল’। সর্বনাম ‘তারা’, ‘যা’, ‘তা’। অনুসর্গ ‘থেকে’, ‘সঙ্গে’। তৎসম শব্দের ব্যবহার সীমিত। কাব্যের প্রয়োজনে আঞ্চলিক বা কথ্য শব্দও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু লেখ্য কাঠামো প্রমিত।

শামসুর রাহমান (১৯২৯–২০০৬) বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর কাব্যে প্রমিত রীতির সফল প্রয়োগ দেখা যায়।

> “স্বাধীনতা তুমি
>
> রবীঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
> স্বাধীনতা তুমি
> কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
> মহান পুরুষ”
> *– শামসুর রাহমান, ‘স্বাধীনতা তুমি’ (১৯৭১)*

এই পঙ্‌ক্তিতে কোনো সাধু রূপ নেই। ‘তুমি’, ‘অজর’, ‘অবিনাশী’ – সবই পমিত রীতির। ছন্দও মুক্ত – গদ্যছন্দের কাছাকাছি।

গদ্য কবিতা

গদ্য কবিতা বাংলা কাব্যভাষার সবচেয়ে আধুনিক ও মুক্ত রূপ। এতে নির্দিষ্ট ছন্দ বা মাত্রার বাধ্যবাধকতা নেই। পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য অসম। মিল প্রায়শই অনুপস্থিত। তবু এর ভেতরে কবিতার আবেগ, ভাব ও সুর থাকে।

বাংলা গদ্য কবিতার সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২২ সালে প্রকাশিত ‘লিপিকা’ গ্রন্থে তিনি প্রথম এই রীতির পরীক্ষা করেন। পরে ‘পুনশ্চ’ (১৯৩২), ‘শেষ সপ্তক’ (১৯৩৫), ‘পত্রপুট’ (১৯৩৬) – এসব কাব্যগ্রন্থে তিনি গদ্য কবিতাকে পূর্ণতা দেন। এই রীতিকে তিনি বলতেন ‘গদ্যছন্দ’।

> “কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি
> ছেলেবেলায় এক বোষ্টমী এসে গান শুনিয়েছিল আমাদের বাড়ির আঙিনায়
> তার শাড়ির রঙ যেন রোদে পোড়া গেরুয়া মাটির”
> *– সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়’ ‘কেউ কথা রাখেনি’ (১৯৬৬)*

এই পঙ্‌ক্তিগুলোতে নিদিষ্ট ছন্দ নেই। পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য আলাদা। মিল নেই। তবু এর ভেতরে কবিতার গভীর আবেগ ও চিত্রকল্প রয়েছে। এটাই গদ্য কবিতার শক্তি।

গদ্য কবিতার ভাষা

গদ্য কবিতার ভাষা সাধারণ গদ্যের মতো মনে হলেও, এর গঠন ভিন্ন। বাক্যগুলো সংক্ষিপ্ত হয়। শব্দচয়ন সচেতন। চিত্রকল্প সঘন। ভাব এক বাক্য থেকে অন্য বাক্যে প্রবাহিত হয়। আজকের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কবি এই রীতিতে কবিতা লেখেন।

> **মনে রাখার মতো:** গদ্য কবিতা গদ্য নয়, কবিতা। এর বাহ্যরূপ গদ্যের, কিন্তু আত্মা কবিতার। ছন্দের বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু ভাব ও চিত্রকল্পের ঘনত্ব আছে।

কাব্যের প্রধান রূপগুলো

বিষয় ও আকারের ভিত্তিতে বাংলা কাব্যের কয়েকটি প্রধান রূপ আছে। প্রতিটি রূপের নিজস্ব নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য আছে।

কাব্যের রূপ	বৈশিষ্ট্য	প্রধান নিদর্শন
মহাকাব্য	বিশাল কাহিনিভিত্তিক দীর্ঘ কাব্য। বীররসপ্রধান। সাধারণত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।	'মেঘনাদবধ কাব্য' – মধুসূদন দত্ত (১৮৬১)
গীতিকাব্য	কবির ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ। সংক্ষিপ্ত ও সুরেলা।	'সোনার তরী' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯৪)
আখ্যানকাব্য	সরল ভাষায় কাহিনি বর্ণনা। ছন্দ থাকে, তবে নাটকীয়তা প্রধান।	'বঙ্গাসুন্দরী' – বিহারীলাল চক্রবর্তী
সনেট	১৪ পঙক্তির নিদিষ্ট গঠন। ৮+৬ বিভাজন। অক্ষরবত্ত ছন্দ।	'চতুদশপদী কবিতাবলী' – মধুসূদন দত্ত (১৮৬৬)
গাথা (ব্যালাড)	লোকগাথামূলক বর্ণনাত্মক কবিতা। বীর বা করুণ রসের।	'মৈমনসিংহ গীতিকা' – দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত
গদ্য কবিতা	ছন্দহীন, মিলহীন। কবিতার ভাব আছে, পদ্যের গঠন নেই।	'পুনশ্চ' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৩২)

বাংলা কাব্যভাষার ইতিহাস হাজার বছরের। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক কবিতা পর্যন্ত এই ভাষা বহু রূপ বদলেছে। মধ্যযুগে এটি ছিল ধর্ম ও পুরাণনির্ভর। উনিশ শতকে মধুসূদন এনেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেট। রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দের সূচনা করেছিলেন। নজরুল এনেছিলেন মাত্রাবৃত্তের নতুন তেজ।

মিশ্র কাব্যভাষা প্রায় এক শতাব্দী জুড়ে বাংলা কবিতার আদর্শ ছিল। ১৯৪৫ সালের পর প্রমিত কাব্যভাষা তার জায়গা নেয়। আজকের কবিতায় ছন্দ, মিল ও মুক্ত গঠন – সবই পাশাপাশি চর্চিত হয়। কাব্যভাষার এই বহুমুখী রূপ বাংলা ভাষার একটি বড়ো সম্পদ।

কাব্যভাষার গবেষণা শুধু সাহিত্যের নয়, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। শব্দের ধ্বনি, পদের গঠন, বাক্যের ক্রম – এসব ভাষার গভীরতম স্তর কবিতায় প্রকাশ পায়। তাই কাব্যভাষার বিশ্লেষণ বাংলা ভাষার চরিত্র বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ।

পদ্যকাব্য ভাষা ও গদ্যকাব্য ভাষার তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি

- *সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা।*
- *সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।*
- *SATT Academy পাঠ্য সংগ্রহ। কাব্য রীতি ও বাংলা ভাষার রীতি।*
- *প্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলা ছন্দ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯২২।*
- *অধিকারী, তাপস। কাব্যের রূপ ও রীতি। ইসলামপুর কলেজ পাঠ্যসংগ্রহ।*
- *অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা।*
- *ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা: সাধু ও চলিতের সংযোগ। গবেষণা প্রবন্ধ।*
- *মুহম্মদ আবু তালিব হোসেন, নজরুলের কাব্যভাষা। নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।*

প্রশ্ন–৪ **গুরুচণ্ডালী দোষ কাকে বলে? এটি দূষণীয় কেন? উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করো।**

উত্তর: সাধু ও চলিত এই দুটি রীতির অন্তর্গত শব্দ ও রূপ যখন একই বাক্যে বা রচনায় মিলিয়ে ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে। 'গুরু' অর্থ সাধু ভাষার উপাদান এবং 'চণ্ডাল' অর্থ চলিত ভাষার উপাদান। এই দুইয়ের অপরিকল্পিত মিশ্রণকেই গুরুচণ্ডালী দোষ বলা হয়।

কেন দূষণীয়?

১. ভাষার সৌন্দর্য ও সংহতি নষ্ট হয়।
২. পাঠক বিভ্রান্ত হন।
৩. ভাষার মান ও শুদ্ধতা ক্ষুণ্ন হয়।
৪. লেখকের ভাষাজ্ঞানের দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

উদাহরণ

গুরুচণ্ডালী দোষযুক্ত বাক্য	শুদ্ধ রূপ
সে বাড়িতে আসিয়াছে এবং খাচ্ছে।	সাধু: সে বাড়িতে আসিয়াছে এবং খাইতেছে। চলিত: সে বাড়িতে এসেছে এবং খাচ্ছে।
তাহারা স্কুলে যাচ্ছে।	সাধু: তাহারা বিদ্যালয়ে যাইতেছে। চলিত: তারা স্কুলে যাচ্ছে।
তোমাদিগকে এখন যেতে হবে।	সাধু: তোমাদিগকে এখন যাইতে হইবে। চলিত: তোমাদেরকে এখন যেতে হবে।
বইটি পড়িয়া আনন্দ পাচ্ছি।	সাধু: বইটি পড়িয়া আনন্দ পাইতেছি। চলিত: বইটি পড়ে আনন্দ পাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ দূষণীয় এবং এটি বর্জন করা অবশ্যই কর্তব্য। কারণ প্রতিটি রীতির নিজস্ব সৌন্দর্য ও কাঠামো রয়েছে। দুটি রীতি আলাদা রাখলে ভাষা স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত হয়।

প্রশ্ন–৫ **সাধু রীতি থেকে চলিত রীতিতে রূপান্তরের প্রধান পাঁচটি নিয়ম লেখো।**

উত্তর:

নিয়ম ১: ক্রিয়া পদের সংক্ষিপ্তকরণ

সাধু ক্রিয়ার দীর্ঘরূপ চলিতে সংক্ষিপ্ত হয়।

সাধু	চলিত
করিয়াছি	করেছি
যাইতেছি	যাচ্ছি
বলিব	বলব
করিতেছিলাম	করছিলাম

নিয়ম ২: সর্বনামের রূপ পরিবর্তন

সাধুর দীর্ঘ সর্বনাম চলিতে সংক্ষিপ্ত হয়।

সাধু	চলিত
তাহারা / তাহার	তারা / তার
উহারা / ইহারা	ওরা / এরা
যাহাদিগকে	যাদেরকে

নিয়ম ৩: তৎসম শব্দ থেকে তদ্ভব শব্দে রূপান্তর

সাধুতে সংস্কৃত শব্দের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়, চলিতে তা পরিবর্তিত হয়।

সাধু (তৎসম)	চলিত (তদ্ভব)
হস্ত, নয়ন, বদন	হাত, চোখ, মুখ

অগ্নি, জল, পুষ্প	আগুন, পানি, ফুল

নিয়ম ৪: অনুসর্গের পরিবর্তন

সাধুর অনুসর্গ (পরসর্গ) চলিতে ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

সাধু অনুসর্গ	চলিত অনুসর্গ
হইতে / হইতেছে	থেকে / হচ্ছে
অপেক্ষা (চেয়ে)	চেয়ে
নিমিত্ত	জন্য

নিয়ম ৫: ক্রিয়াবিশেষণ ও অব্যয়ের পরিবর্তন

সাধুর অব্যয় ও ক্রিয়াবিশেষণও চলিতে পরিবর্তিত হয়।

সাধু	চলিত
অতঃপর, অদ্য	এরপর, আজ
তথাপি, তথায়	তবুও / তা সত্ত্বেও, সেখানে
কল্য, প্রত্যহ	কাল, প্রতিদিন
যদ্যপি, ইতস্তত	যদিও, ইতিউতি

প্রশ্ন–৬ **সাধু রূপ থেকে চলিত রূপে পরিবর্তন করো।**

সাধু রূপ	চলিত রূপ	সাধু রূপ	চলিত রূপ
অতঃপর	এরপর	করিলাম	করলাম
অদ্য	আজ	কল্য	কাল
অপেক্ষা (অনুসর্গ)	চেয়ে	কার্যকালে	কাজের সময়
আগমন করিতেছেন	আসছেন	গ্রহণপূর্বক	গ্রহণ করে / নিয়ে
আগমন করিয়াছি	এসেছি	তথাপি	তবুও / তাসত্ত্বেও
আজ্ঞাক্রমে	আদেশ অনুসারে	তথায়	সেখানে
ইতস্তত	ইতিউতি / এদিক-ওদিক	তদনুসারে	সেইমতো
করিতে	করতে	তদীয়	তার
করিতেছি	করছি	তাহাদিগকে	তাদেরকে
সাধু রূপ	**চলিত রূপ**	**সাধু রূপ**	**চলিত রূপ**
করিতেছিল	করছিল	তাহাদিগের	তাদের
করিতেছিলাম	করছিলাম	থাকিতে	থাকতে
করিতেছিলে	করছিলে	দর্শন করিতে	দেখতে
করিব	করব	দর্শনপূর্বক	দর্শন করে / দেখে
করিয়া	করে	দেখিয়া	দেখে
করিয়া থাকিব	করে থাকব	নিমিত্ত	জন্য
করিয়াছি	করেছি	প্রত্যহ	প্রতিদিন
করিয়াছিলাম	করেছিলাম	বলপূর্বক	জোরে / জোর করে
করিয়াছে	করেছে	বলিয়া	বলে
করিয়ো	কোরো	মদীয়	আমার

* **বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সাধারণ বর্তমান কালে 'করি' রূপটি সাধু ও চলিত উভয় রীতিতেই একরকম থাকে। তবে ক্রিয়াধাতু পরিবর্তন সম্ভব হলে করতে হবে 'গমন করি' ⟶ 'যাই', 'ভোজন করি' ⟶ 'খাই'।

প্রশ্ন–৭ **বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করো।**

উত্তর: বাংলা ভাষা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ও প্রাচীন সাহিত্যভাষা। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান-এর ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে। বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাপরিবার-এর অন্তর্গত এবং এর বিকাশধারা বহু শতাব্দী ধরে বিস্তৃত।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

বাংলা ভাষার বংশপরম্পরা সাধারণত নিম্নরূপ–

ইন্দো-ইউরোপীয় ⟶ ইন্দো–ইরানীয় ⟶ ভারতীয় আয ⟶ পাচীন ভারতীয় আয (সংস্কৃত) ⟶ মধ্য ভারতীয় আয (পাকত) ⟶ অপভ্রংশ ⟶ অবহট্ট ⟶ বাংলা

ভাষাবিদদের মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে মূলত মাগধী প্রাকৃত, মাগধী অপভ্রংশ এবং অবহট্ট ভাষার ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে। খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ভাষার প্রাথমিক রূপ গড়ে উঠতে শুরু করে।

বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ

বাংলা ভাষার বিকাশকে সাধারণত তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা হয়–

যুগ	সময়কাল	বৈশিষ্ট্য
প্রাচীন বাংলা	৯৫০–১২০০ খ্রিষ্টাব্দ	বাংলা ভাষার আদি রূপের বিকাশ
মধ্য বাংলা	১২০১–১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ	সাহিত্য ও শব্দভান্ডারের ব্যাপক সমৃদ্ধি
আধুনিক বাংলা	১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান	প্রমিত রূপের প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক সাহিত্যচর্চা

১. প্রাচীন বাংলা যুগ (৯৫০–১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হলো চর্যাপদ। এটি বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত গীতিকবিতার সংকলন। চর্যাপদের ভাষায় বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ও মৈথিলি ভাষার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই যুগে বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করতে শুরু করে।

২. মধ্য বাংলা যুগ (১২০১–১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ)

এই সময়ে বাংলা ভাষা সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিকাশ লাভ করে। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, অনুবাদ সাহিত্য এবং মুসলিম কবিদের রচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়। এ সময়ে আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষা থেকে বহু শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে। ফলে বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার আরও সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে।

৩. আধুনিক বাংলা যুগ (১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ–বর্তমান)

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের বিকাশ এবং মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসারের ফলে বাংলা ভাষা আধুনিক রূপ লাভ করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সংস্কার ও ব্যাকরণ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কাজী নজরুল ইসলাম-এর সাহিত্যকর্ম বাংলা ভাষাকে বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

বর্তমানে বাংলা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভাষা। বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামের কিছু অঞ্চলে বাংলা প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছে।

বাংলা ভাষার ইতিহাস প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী। সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও অবহট্টের ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। দীর্ঘ সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশের ফলে বাংলা আজ বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়েছে। এর ঐতিহ্য ও বিকাশধারা বাঙালি জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।